মহাকবি

মধুসূদন

(জীবন-নাট্য)

শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার
কবিভূষণ

প্রকাশক—
যশোহর সাহিত্য সঙ্ঘ
(যশোহর)

মূল্য ২॥০ টাকা

প্রিণ্টার—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য
শৈলেন প্রেস
৪, সিমলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

উৎসর্গ

প্রণতি

নমো নমো মধুসূদন !
মনোবীণা তারে তব সুধা ঝরে,
তিরপিত চিত্ত-নন্দন।

ব্যথা ভরা এই মানব জীবনে,
শতবিষ শিখা জ্বলে ক্ষণে ক্ষণে,
তার মাঝে সুধা হরি লয় ক্ষুধা,
কবি মধু গাথা স্মরণ।

আপনারে জ্বালি জ্বলন্ত পাবকে,
সুবাস বিতরে ধূপ লোকে লোকে।
তুমি কবি হায়, তব প্রতিভায়,
তনু তিলে তিলে, করিলে যে ক্ষয়,
মধুচক্র করি রচন।

তবু তুমি আজও হৃদয়ে বিরাজ,
কীর্ত্তির মাঝে কবি অধিরাজ,
চির নন্দিত বাণী নন্দন।

৩০শে বৈশাখ, ১৩৫০
১৪ই মে, ১৯৪৩

শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার
যশোহর সাহিত্য সঙ্ঘ

নিবেদন

মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের আবির্ভাব—১৮২৪ খৃঃ ২৫শে জানুয়ারী, তিরোধান—১৮৭৩ খৃঃ ২৯শে জুন, রবিবার।

অমর মহাকবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত যশোহরের সন্তান। তাঁহার জীবন আমার নিকট গৌরবের বস্তু। তিনখানি নাটক থাকিলেও এই জীবন-নাট্য আমি কেন রচনা করিলাম তাহার কৈফিয়েৎ স্বরূপ বলিতে পারি, কবিকে আমি যে চক্ষে দেখিয়াছি, তাহাই পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ভালমন্দ বিচার করিবার ভার বঙ্গভাষানুরাগী সুধী সমাজ ও জনসাধারণের।

যে কোন জীবনের অনেকগুলি দিক থাকে, সকলগুলি সকলের যে উজ্জ্বল হইবে এমন কোন কথা নাই। কবির জীবন, কবিত্বের বিকাশ দিকটা দেখিয়া বিচার করিয়াছি। তাহার ব্যক্তিগত জীবনকে যতটুকু প্রয়োজন তাহার অধিক দেখি নাই।

মহাকবির জীবন-নাট্য এমন ভাবে রচনা করিয়াছি, যে পাঠ করিলে তাঁহার জীবন ও কাব্যকে জানিবার সুযোগ হইবে। জীবনের উল্লেখ-যোগ্য ঘটনাগুলি স্তর হিসাবে সন্নিবেশ করিয়াছি। তবে নাটক, নাটক। রসসৃষ্টির জন্য কিছু কল্পনার আশ্রয়ও লইয়াছি। প্রস্তাবনাটী কবির জীবনের পূর্ব্বাভাষ মাত্র, নাটক অভিনয় কালে এই অংশ বাদ দেওয়াই ভাল।

বাংলার ভারতীস্বরূপা শ্রীমতী অনুরূপা দেবী পুস্তকখানি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন, এবং একটি আশীর্ব্বাণী লিখিয়া গ্রন্থের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন, এজন্য তাঁহার নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ রহিব।

পণ্ডিত কেদারনাথ ভারতী স্মৃতিসাংখ্যমীমাংসাতীর্থ মহাশয় পুস্তক-খানি পাঠ করিয়া আনন্দপ্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার উৎসাহ বাণী আমাকে নিয়তই সাহিত্য-সাধনায় উৎসাহিত রাখিয়াছে। শ্রীমান হরিপদ ভারতী এম, এ, অধ্যাপক যশোহর কলেজ এই পুস্তক রচনা কালে কয়েকটি দৃশ্যের উৎকর্ষ সাধনে সহায় হইয়াছেন। নটশেখর শ্রীযুত নরেশচন্দ্র মিত্র মহাশয় "মহাকবি মধুসূদন" পাঠে প্রীতি প্রকাশ করিয়াছেন। যশোহর সাহিত্য সঙ্ঘের বিশিষ্ট সভ্য শ্রীযুত বিমলাকান্ত সর্ব্বজ্ঞ এম, এ ; বি, টি মহাশয়ের ভূমিকাটি তথ্যপূর্ণ হইয়াছে ; এজন্য তাঁহার নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

যশোহর
৩০শে বৈশাখ, ১৩৫০
১৪ই মে, ১৯৪৩

নিবেদক—
শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার

ভূমিকা

"কাব্য পড়ে' যেমন ভাব, কবি তেমন নয় গো"—কবীন্দ্রের এই অনুপম উক্তিটি অপর অনেক কবি সম্বন্ধে সত্য হইলেও, মহাকবি মধুসূদন সম্বন্ধে যেন ঠিক খাটে না। বাস্তবিক, মহাকবির মহা ঐশ্বর্য্যশালী মানস জীবনের সঙ্গে তাঁহার বাস্তব জীবনের রূঢ় দ্বন্দ্ব চিরদিনের ব্যথা ও বিস্ময়ের বিষয় হইলেও মধুসূদনের জীবনে কবিতাই ছিল একমাত্র সাধনার বিষয়। কবিতা তাঁহার নিকট নিঃশ্বাসের ন্যায় সহজ ও প্রয়োজনীয় ছিল। কবিতার মধ্যেই তাঁহার জীবন স্ফূর্ত্ত হইয়াছিল।

ইংরাজ কবি Miltonএর ন্যায় এই বাংলার মিল্টনের জীবন-নাটিকা খানিও তিনটি অঙ্কে বিভক্ত। নাটককার শ্রীযুক্ত অবলাকান্ত মজুমদার মহাশয়ও তাঁহার নাটকে এই স্বাভাবিক বিভাগ গ্রহণ করিয়াছেন।

জীবনের সুষ্ঠু রূপায়নই নাটক। ঘটনার দ্বন্দ্ব প্রাচুর্য্যে ইহার জন্ম, অবস্থার ঘাত প্রতিঘাতে ইহার বৃদ্ধি ও পরিণতি, পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্যে বা বিরোধে ইহার পরিসমাপ্তি। নাটককে দৃশ্য কাব্যও বলা হয়। সুতরাং কাব্যের সুষমা ও ভাষার মাধুর্য্য দিয়া ইহার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হয়, চরিত্রাঙ্কণের নৈপুণ্যদ্বারা ইহাকে সতেজ ও স্বাভাবিক করিতে হয়। কথোপকথনের দ্যুতিতে ইহাকে সাবলীল করিতে হয়। দরদী বুকের ব্যথা ও মরমীর কথা দিয়া হাসি অশ্রুর যে মালিকাখানি গাঁথা হয়, কাব্যে তাহা ইন্দ্রধনুর মায়াজাল সৃষ্টি করে ও নাটকে তাহা জীবন্ত প্রতিমা গঠন করে। এই প্রতিমা জীবনের রসে যতই পুষ্ট হয়, আমাদের হৃদয়-মন্দিরে ইহার আসন ততই সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনকথা বাস্তবিকই বড়ই বিচিত্র ও ঘটনা-বহুল। নাটকের বহু উপাদান ইহার মধ্যে রহিয়াছে। তাহার উপর, কবিরাজ অবলাকান্ত মজুমদার মহাশয় কবিবরের একজন একনিষ্ঠ ভক্ত। ভক্তের আরাধনায় আরাধ্য দেবের যে কোন মূর্ত্তি তাহার মানসপটে জাগিয়া উঠে, ভক্তও তাহা অনেক সময়ে জানিতে পারেন না। সেই জন্যই একই বিষয় বিভিন্ন লেখকের তুলিতে বিভিন্নভাবে অঙ্কিত হয়। মধুসূদন সম্বন্ধে আরও নাটক রচিত হইয়াছে। কিন্তু বক্ষ্যমান নাটক-খানি সে সমস্ত হইতে অনেকটা পৃথক। অবলাবাবুর ধ্যান নয়নে কবিবরের কাব্যোন্মাদনাই রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। আমার বিশ্বাস, অপরের পন্থা অনুসৃত না হইলেও, এই নাটকখানিতে মহাকবির জীবনের বৈশিষ্ট্য বেশ করুণ ও মধুরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। মহাকবির মাতৃভক্তি, স্বদেশপ্রীতি, নির্ভীকতা, ইংলণ্ডের প্রতি তীর্থযাত্রীর টান, বন্ধুপ্রীতি, পত্নীপ্রেম, সন্তানবাৎসল্য, দারিদ্র্য নিপীড়িত জীবনের মর্ম্মন্তুদ কশাঘাত আজন্ম বাণী-সাধনা প্রভৃতি সুন্দরভাবে এই নাটকে অঙ্কিত হইয়াছে। শুধু অনুতপ্ত হৃদয়ের হাহাকার ইহাতে পাই না।

নাটকখানি পড়িতে পড়িতে বহুস্থানে চক্ষু সজল হইয়াছে এবং আমার বিশ্বাস নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ ইহা পড়িয়া আমাদের সঙ্গে বাংলার এই বিভ্রান্ত প্রতিভার পাদমূলে দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু ফেলিবেন। ইতি—

শ্রীবিমলাকান্ত সর্ব্বজ্ঞ এম, এ; বি, টি,
বাচস্পতি, বাক্‌শ্রী

চরিত্র

মধুসূদন দত্ত	...	মহাকবি
রাজনারায়ণ দত্ত	...	ঐ পিতা
গৌরদাস বসাক	...	ঐ সহপাঠী
ভূদেব মুখোপাধ্যায়	...	"
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর	...	সমসাময়িক ব্যক্তি
বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	...	"
মনোমোহন ঘোষ	...	"
প্যারীচরণ	...	রাজনারায়ণের ভ্রাতুষ্পুত্র
আলবার্ট নেপোলিয়ন	...	মধুসূদনের কনিষ্ঠ পুত্র

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

হিমাংশু	...	প্যারীচরণের জামাতা

পণ্ডিতমশাই, পাওনাদারগণ, বৈষ্ণব, সহপাঠী, দীননাথ, অর্জ্জুন লাঠিয়াল, পাঠশালার ছাত্রগণ, মেঘনাদ, লক্ষ্মণ, বিভীষণ।

জাহ্নবী দেবী	...	মধুসূদনের মাতা
হেনরিয়েটা	...	ঐ পত্নী
লিলি	...	মধুসূদনের কন্যা
অমিয়ারাণী	...	প্যারীচরণের স্ত্রী
লীলা	...	ঐ কন্যা

লক্ষ্মীদেবী, সরস্বতীদেবী, শ্রীরাধা, শ্রীবিশাখা।

মহাকবি

মধুসূদন

প্রস্তাবনা

বনপথ

সরস্বতী ও লক্ষ্মী

লক্ষ্মী। না দিদি! তোমায় নয়, আমায় ভালবাসে বিশ্ববাসী সর্ব্বজন।

সরস্বতী। না বোন! আমায় ভালবাসে জগতের শ্রেষ্ঠ মনীষীবৃন্দ।

লক্ষ্মী। মনীষী জগতে কতজন আছে দিদি? তাদের সংখ্যা যে এই আঙ্গুলে গণনা করা যায়।

সরঃ। সংখ্যায় কি হয় বোন। বনভূমিতে অসংখ্য শৃগাল, শশক বিচরণ করে, কিন্তু একক সিংহ তাদের উপর প্রভুত্ব করে থাকে।

লক্ষ্মী। চেয়ে দেখ দিদি! আমার শ্যামল অঞ্চল পাতা বনভূমির প্রতি। তার তৃণদল সবুজের সমারোহ নিয়ে মৃদুমন্দ পবনের সঙ্গে খেলা কর্চ্ছে। তার বৃক্ষরাজি নব কিশলয়ে, বৈচিত্র্যময় কুসুম স্তবকে, নবজাত ফলের আনন্দে আত্মহারা, তার ক্ষেত্র মাঝে জীবের জীবন-দায়িনী শস্য-সম্পদ্ অপূর্ব্ব আনন্দে আমার আশীর্ব্বাদ বহন কর্চ্ছে! তাই মানুষ আমায় ভক্তিনম্র প্রণতি জ্ঞাপন কর্চ্ছে নিশিদিন, তোমায় নয়।

সরঃ। ব্রহ্মময়ী আমি জীবের কণ্ঠে শব্দরূপে বিরাজ কর্চ্ছি, তাই বনভূমি সঙ্গীতের সুমধুর ঝঙ্কারে আনন্দময়, আমি শব্দরূপে পবন-প্রবাহে

লুকিয়ে আছি, তাই বিশ্বের এক প্রান্ত হতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বার্ত্তা প্রচার করা সম্ভব হয়ে থাকে। আমি ভাষারূপে জ্ঞানীর বচন-মাধুর্য্যে, লেখনীর সুধা নির্ঝরে, যন্ত্রের সুরতরঙ্গে বিরাজিতা; আমারি অনুকম্পায় ধরণীর জ্ঞান বিস্তার সম্ভব হয়েছে, তোমার নয়। তাই জগৎ জীব আমায় পূজা করে, শ্রদ্ধা করে হৃদয়-মন্দিরের সুবর্ণ সিংহাসনে প্রতিষ্ঠা করে।

লক্ষ্মী। আমার আশীষ-পূত মানব, সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

সরঃ। আমার আশীর্ব্বাদে, মানুষ, জ্ঞানামৃত পান করে অমরত্ব লাভ করে।

লক্ষ্মী। মিথ্যাকথা, আমিই মানুষের পূজ্যা, তুমি নও।

সরঃ। তোমার বোন এ নিতান্তই আত্মম্ভরিতা।

লক্ষ্মী। তোমারও এই দাবী নিতান্ত স্বার্থপরতা।

সরঃ। হের বোন! ঐ লাবণ্যে প্রভাময় কান্তি, প্রশান্ত বদন, প্রতিভায় সমুজ্জ্বল নয়ন এক যুবক এইদিকেই আসছে, একেই জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি আমরা।

লক্ষ্মী। একেই জিজ্ঞাসা কর। আমার আপত্তি নাই।

মধুসূদনের প্রবেশ

সরঃ। শোন যুবক! আমরা তোমার নিকট বিচার প্রার্থী!

মধু। কে তুমি মা তুষার-বরণী, বীণা-বাদিনী মহিমময়ী?

সরঃ। আমি জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী, আর ইনি আমার বোন, ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী।

মধু। মা! মা! আমার চির আরাধ্য দেবী! আমার ভক্তি নত প্রণতি গ্রহণ কর মা!

বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি
আমি, ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভূজে

ভারতি! যেমতি, মাতঃ বসিলা আসিয়া,
বাল্মীকির রসনায় (পদ্মাসনে যেন)
যবে খরতর শরে, গহন কাননে,
ক্রৌঞ্চ বধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিঁধিলা,
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর সতি!

সরঃ। অমরত্ব বর লহ পুত্র মোর।

লক্ষ্মী। পুত্র! আমার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

মধু। হে জননী, জ্ঞানদায়িনী বীণাপাণি! আমায় আশীর্ব্বাদ দাও মা! যেন আমি কবিত্বশক্তি লাভ কর্ত্তে পারি—

গৌড় জন যাহে, আনন্দে
করিবে পান সুধা নিরবধি।

লক্ষ্মী। আমায় উপেক্ষা! আমি আশীর্ব্বাদ কল্‌র্ম, আমায় একটা শুদ্ধ প্রণামও কর্লে না!

সরঃ। লক্ষ্মীদেবীকে প্রণাম কর পুত্র!

মধু। আমি ঐশ্বর্য্য চাহিনা মাতা! আমি চাই জ্ঞান। আমি চাই কবিত্বের অমৃত। যার স্পর্শে প্রাণ, মন, আত্মা শাশ্বত আনন্দে আত্মহারা হয়ে যায়। জগতের ধন সম্পত্তি তার নিকট অতীব তুচ্ছ।

লক্ষ্মী। এতদূর! আমি তোমায় অভিশাপ দিয়ে যাই মধুসূদন! তোমার জ্ঞান, তোমার কবিত্ব, তোমায় সুখী করতে পার্ব্বে না, আমার অভিশাপে তোমার সম্পদ্ বিলুপ্ত হবে, অভাবের তাড়নায় তোমার জ্ঞানের জ্যোতিঃ, কবিত্বের আনন্দ, চির অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে।

মধু। মা! মা!

লক্ষ্মী। কমলার অভিশাপ ফিরবে না মধু! তোমার এ শাস্তি পেতেই হবে!

সরঃ। তোমার ক্রুদ্ধ অন্তরের এই যে গরল, আমার পুত্রকে স্পর্শ কর্ত্তে আমি দেবো না বোন।

লক্ষ্মী। তাই কর! রক্ষা কর তোমার মধুসূদনকে। আমাকে অবহেলা! আমাকে তুচ্ছ জ্ঞান! বিশ্বজনে যার অনুকম্পা লাভের জন্য সতত পূজা করে, তার প্রতি উপেক্ষা!

মধু। আমায় কি অভিশাপ দেবে মা লক্ষ্মী! আমার প্রাণে একটুকুও আকাঙ্খা নাই তোমার আশীর্ব্বাদ লাভ কর্ব্বার! আমি আমার এই জননীর পদছায়ায় শান্তি পেতে চাই।

(সরস্বতী দেবীকে পুনরায় প্রণাম করিলেন)

লক্ষ্মী। তাই পাও তবে! আমি তোমার অদৃষ্টগগনে রাহুরূপে বিরাজ কর্ব্ব। দেখব কত শক্তি আছে তোমার—এই জ্ঞানদায়িনী জননীর!

মধু। বৃথা অভিশাপ দিও না মা লক্ষ্মী! তোমার কৃপাকে আমি অতীব তুচ্ছ মনে করি! আমার সাধনার বলে তোমার এই অভিশাপ আমি ব্যর্থ করে দেবো!

সরঃ। আমার আশীর্ব্বাদ আবার লহ পুত্র!
অমরত্ব হবে তব জীবনে নিশ্চয়।

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

খিদিরপুর জেমস্ লেন

রাজনারায়ণ দত্তের গৃহকক্ষ

জাহ্নবী দেবী ও লীলা

জাহ্নবী। বেলা পড়ে এল, মধু এখনো বাড়ী ফিরল না, আজ কলেজে হচ্ছে কি জানিস লীলা ?

লীলা। না ঠাকুমা! মধুকাকা তো কিছুই বলে যায় নি! বরং বলেছিলেন আজ সন্ধ্যায় রামায়ণ পড়ে শোনাবেন।

জাহ্নবী। রামায়ণ পড়ে শোনাবে মধু! হাঁ লীলা ? তোকে মধু সত্যি বলে গেছে যে আজ রামায়ণ পড়ে শোনাবে ?

লীলা। হাঁ ঠাকুমা! মধুকাকা যে রাত্রে রাত্রে তোমার এই রামায়ণখানা পড়ে থাকেন।

জাহ্নবী। অথচ আমায় মুখে বলে, এই বই পড়ে কি হবে! ইংরাজীতে নাকি এর চাইতে ভাল ভাল বই আছে।

লীলা। ওটা তাঁর মনের কথা নয় ঠাকুমা!

জাহ্নবী। তাই বল! আমার ছেলে রামায়ণ পড়বে না! তাকে যে ছোট কাল থেকে রামায়ণের গল্প শুনাচ্ছি, সীতার বনবাস শুনতে শুনতে কতদিন তার চোখ দুটি জলে ভরে এসেছে। লবকুশের যুদ্ধের কথায় তার বুক দুলে উঠেছে!

লীলা। এখন কি রামায়ণ পড়ে শোনাব ঠাকুমা ?

জাহ্নবী। তাইত! মনটা আমার প্রসন্ন নেই, মধু কেন এখনো এল না। পথে কত বিপদ্ থাকতে পারে!

রাজনারায়ণের প্রবেশ

রাজ। বাঘুটের ঘোষ বংশ হতে মধুর বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে ঘটক এসেছে।

জাহ্নবী। বেশত! মেয়েটি দেখা শোনা কর। আস্‌ছে বৈশাখ মাসে বিয়ে হতে পারে।

রাজ। হাঁ, আমিও তাই ভাবছি। এত বড় মুখ্য কুলীন বংশ, বাংলা-দেশের কায়স্থ সমাজে আর নাই। সম্বন্ধের মত সম্বন্ধ! তোমার পুত্রবধূ পাবার আগ্রহটা হয়ত এবার সিদ্ধ হবে। দেখি, ঘটকের সঙ্গে কথা বার্ত্তা কয়ে দেখি! তার জলপানের ব্যবস্থা কর।

প্রস্থান

জাহ্নবী। হাঁ, লীলা! তোর সাগরদাঁড়ীর বাড়ী ভাল লাগে, না, কলকাতার বাড়ী ভাল লাগে?

লীলা। কলকাতার হাওয়া যেন কেমন বদ্ধ। দম বন্ধ হয়ে আসে, সাগরদাঁড়ীর কপোতাক্ষী নদীর মুক্ত হাওয়া প্রাণ শীতল করে দেয়। তবু থাকব, মধুকাকার বিয়ে, কি মজা! কাকীমাকে পেলে মনটা ভালই থাকবে!

মধুসূদনের প্রবেশ

জাহ্নবী। এত বেলা গেল কেনরে মধু?

মধু। আমাদের প্রিনসিপ্যাল লেক্‌চার দিচ্ছিলেন, তাই, দেরী হল। বেশ লোক মা। নূতন এসেছেন বিলাত হতে, কি তাঁর ভাষা-বোধ; কি তাঁর বলবার ভঙ্গী। আমি তন্ময় হয়ে শুনছিলাম।

আমার কাছে এসে কত আলাপ কর্লেন! হাঁ, মা! আমি বিলাত যাব?

জাহ্নবী। শোন লীলা! আমার পাগলা ছেলের কথাটা একবার। বিলাত যাব! সাগরদাঁড়ীর দত্ত বংশ তোমায় বিলাত পাঠাবে না কি? সমাজ সে মত দেবে?

মধু। সমাজ টমাজ আমি বুঝি না মা! আমার চাই শিক্ষা, কবিত্ব, জ্ঞান, যাতে করে মানুষ, মানুষ হতে পারে।—তোর হাতে ওখানা কি বইরে লীলা?

লীলা। রামায়ণ!

মধু। তোমার সীতার জন্য আমার বড় দুঃখ হয় মা। কিন্তু রামচন্দ্র একেবারেই অকর্ম্মা!

জাহ্নবী। ছিঃ, ও কথা কি মুখে আনতে আছে বাবা! রামচন্দ্র অবতার, তাঁর প্রতি প্রণাম কর, বাবা! নইলে অকল্যাণ হবে যে! এই নাও রামায়ণ, প্রণাম কর। নইলে আমার প্রাণে ব্যথা রইবে।

মধু। তোমার জন্য আমি সব কর্ত্তে পারি মা।—আন্‌তো লীলা রামায়ণ। এই নাও, প্রণাম কর্লাম, হল ত মা!

জাহ্নবী। হাত পা ধুয়ে এখন খাবার খাও, বাছা। তোমার বাবা এখনি আসবেন। বিশেষ কথা আছে বলছিলেন। লীলা এই খাবারটা বাইরের ঘরে দিয়ে আয় মা।

(লীলা খাবার লইয়া বাহিরের ঘরে গেল ও কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসিল।)

মধু। বাবা কি বলবেন! আমি খাবার খাচ্ছি ততক্ষণ লীলা তুই সেই সীতার গানটা একটু গা-না লক্ষ্মী!

লীলা। বেশ গাইছি! শোন, কিন্তু মন দিয়ে; সে দিনকার মত ছুটাছুটি করো না।

গীত

ওগো সীতা! ওগো সীতা!
জনক-নন্দিনী, সীতাশিরোমণি,
রাম প্রেম-হরষিতা !!
সরযূ সমীর আজিও অধীর,
কাঁদিয়া ফিরিছে হায়।
মায়ের পরশ অমৃত সরস
এখনো লভিতে চায়।
অযোধ্যা নগরী আজিও আবরি
জ্বলে যেন মনঃচিতা,
কাঁদে কুশীলব, কাঁদিছে রাঘব,
কাঁদে প্রজা মনোভীতা॥
লহ মম নতি হৃদয় আরতি
ঋষির আশীষ পূতা,
প্রেমের প্রতিমা, নারী অনুপমা,
ধরণী দুহিতা সীতা।

রাজনারায়ণ দত্তের প্রবেশ

রাজ। হাঁ, গিন্নি, ঘটক বলে গেলেন আসছে বুধবারে মেয়ে দেখতে যেতে।

মধু। (উঠিয়া দাঁড়াইয়া) বাবা! আমায় কি বললেন আপনি—তাই মা বলছিলেন।

রাজ। হাঁ, বলতে হবে। তোমার বিয়ে দেব স্থির করেছি, বাঘুটের ঘোষ বংশের একটা মেয়ে বুধবারে দেখতে যাব!

মধু। আমার বিয়ে। আমি যে এখনো মত স্থির কর্ত্তে পারিনি।

রাজ। তোমার আবার মত কি? আমি যা বলছি, তাই শোন! তোমার বিয়ের কথাবার্ত্তা চল্‌ছে।

মধু। অল্‌রাইট্‌, আমি ভেবে দেখি। বাবা! আমার একশ টাকা চাই। কতকগুলা ইংরেজী বই কিন্‌ব ভাবছি।

রাজ। বইতো ইম্পিরিয়েল লাইব্রেরীতে পড়তে পার!

মধু। লাইব্রেরীতে বসে বই পড়ব আমি! না বাবা! তোমার তাতে মর্য্যাদা লাঘব হবে।

রাজ। মাই বয়! তোমার দেখছি দত্ত-বংশের মর্য্যাদাটা মর্ম্মে মর্ম্মে প্রবেশ করেছে। আমি তোমার এই ভাবটাকে ভালই বলছি।

মধু। আমার জন্য দু'টি স্যুটের অর্ডার দিয়েছি সাহেব বাড়ীতে! একশ টাকা লাগবে।

রাজ। সাহেবদের সঙ্গে মিশতে হলে তাদের মত পোষাক চাই বই কি! কাল টাকা নিয়ে যেয়ো।

মধু। গৌরদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ আছে বাবা! এখনি যেতে হবে!

রাজ। যাও। কিন্তু, কাল বৈকালে বাড়ীতে থেকো, তোমায় দেখতে আসবেন।

মধু। আমায় দেখতে আসবার কোন প্রয়োজন নাই।

রাজ। অর্থাৎ।

মধু। আমি এখন বিয়ে কর্ব্ব না বাবা।

রাজ। বেয়াদপ্‌! আমার মুখের ওপর কথা। আলবৎ তুমি বিয়ে কর্ব্বে! একশবার তুমি বিয়ে কর্ব্বে। আমি যা বলব তাই করবে তুমি!

জাহ্নবী। মধু! বাপ আমার, ওঁর মুখের ওপর উত্তর দিয়ো না। জানত ওঁর মেজাজ!

মধু। মাই ডিয়ার মাদার! তোমার কথা আমি নিশ্চয় শুন্‌ব! চল আমায় পোষাক পরিয়ে দেবে। গৌরদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণে যাবো।

জাহ্নবী। চল বাবা! উভয়ের প্রস্থান

রাজ। লীলা!

লীলা। ঠাকুরদা!

রাজ। চল্‌ত সেই তেলটা আমার মাথায় দিয়ে দিবি। ওষুধটা খাইয়ে দিবি। আমার শরীর কাঁপছে!

দ্বিতীয় দৃশ্য

গৌরদাস বসাকের বাড়ী

লাইব্রেরী কক্ষ

মধু, ভূদেব, গৌরদাস

মধু। তুমি যাই বল ভূদেব, আমি প্যানপেনে, অশিক্ষিতা গ্রামের মেয়ে বিয়ে কর্ত্তে পার্‌ব না। তা, মা বাবার কথাতেও না।

ভূদেব। মায়ের মত হিতৈষী পৃথিবীতে নাই মধু।

মধু। পৃথিবী, না, প্রথিবী? তুমি ভূদেব এতবড় ভুল্‌টা করলে?

ভূদেব। বাংলা বইও দু'চারখানা পড়ো মধু, নইলে বাংলাদেশে বাস করা চলে না।

মধু। অর্থাৎ?

ভূদেব। অর্থাৎ, পৃথিবীকে প্রথিবী বল্‌বে, এতে যে তুমি ভদ্র সমাজে হাস্যাস্পদ হবে!

মধু। অবিধান আছে গৌর! বার কর দেখি কেমন পৃথিবী! (অভিধান দেখিয়া) তাইত! ভূদেব আমি হার মানলুম।

ভূদেব। বাঙ্গালীর ছেলে! বাংলা ভাষাটা জান না, এতে গৌরব নাই মধু!

মধু। তা যা বলেছ ভূদেব! ঠিকই বলেছ, আমি বাংলা বই পড়তে চেষ্টা কর্ব্ব। তবে, ও ভাষায় আছে কি?

গৌর। তোমার মত প্রতিভাশালী ছেলে, যদি, এই ভাষার জন্য সাধনা করে তবে, না থাক্‌বে কি?

ভূদেব। ঠিক্‌ই বলেছ গৌর! এস, আমরা সবাই চেষ্টা করি মাতৃভাষার সম্পদ বৃদ্ধি কর্ত্তে।

মধু। তোমার কথায় আমি মনে আঘাত পেয়েছি ভূদেব! শৈশবে যে ভাষার মধুর মাতৃনাম উচ্চারণ করেছি, বাল্যে যে ভাষায় সঙ্গীদের সাথে খেলায়, গল্পে আনন্দ পেয়েছি, আজও যে ভাষার বাণী প্রাণে আনন্দের তুফান তোলে, সেই অমৃত মাখা বাংলা ভাষার আমি অনুশীলন কর্ব্ব, আজ প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি! তোমার মত সৎব্রাহ্মণকে স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি ভূদেব।

গৌর। তাই কর মধু, তাই কর! তোমার সৃষ্টি কর্ব্বার প্রতিভা আছে, সে প্রতিভাকে দেশের কল্যাণে নিয়োজিত কর!

মধু। দেখত ভূদেব! কেমন চুল কেটেছি। এর জন্য আমি এক গিনি দিয়েছি।

ভূদেব। এক গিনি! বল কি মধু! তোমার প্রাণ দেখছি গড়ের মাঠ! এত অপব্যয় ভাল নয়! তোমার বাবা বারণ করেন না!

মধু। বাবা এত ছোটখাট ব্যয় দেখ্‌তে আসেন না। মা আমার আব্দারকে কোন দিনই ব্যর্থ করেন নি।

গৌর। ওর বাপ একে জমিদার, আবার উকিল। আয় করেন ভালই। ওর কথা আলাদা।

ভূদেব। মধুর জীবনে সংযমের বড় অভাব! সংযমের প্রয়োজন জীবনে। নহিলে ভবিষ্যৎ……

মধু। ভূদেব! তুমি যাই বল, আমি কিন্তু মার কথা, বাবার কথা সবই শুনব, কেবল ঐ বিয়ের অনুরোধ বাদে।

গৌর। তোমার মায়ের ম্লান মুখ মনে পড়লে আমারও মন বিষাদে ভরে উঠে মধু! আমার কথা শোন লক্ষীটী। মা বাবার অনুরোধ, মা বাবার ইচ্ছা, তুমি তুচ্ছ করো না, এতে তাঁরা মর্ম্মাহত হবেন।

মধু। মার কথায় আমি মরতে পারি গৌর। কিন্তু, মার কথায় বিয়ে করতে পার্ব্ব না।

ভূদেব। বিয়েটাই কিন্তু আমাদের সমাজে গুরুজনের মতামতের উপর নির্ভর করে।

মধু। সমাজের সকল বিধিই যে ত্রুটি-শূন্য, তা, নাও হতে পারে।

ভূদেব। আর্য ঋষিদের ব্যবস্থা সমাজের কল্যাণই সাধন করে আসছে যুগ যুগ ধরে।

মধু। পাশ্চাত্য ঋষিরাও আর্য্য! আর তাঁদের ব্যবস্থাও সমাজে হিত করে থাকে। নইলে তাঁরা বিশ্বের এত বরেণ্য হতে পার্ত্তেন না।

ভূদেব। দেশ ও কাল অনুযায়ী ব্যবস্থার প্রভেদ হয়ে থাকে মধু! আমাদের সমাজ এই ব্যবস্থায় গড়ে উঠেছে, তোমার মত যুবকের মতে তার পরিবর্ত্তন হবে না।

মধু। আমি সমাজ ও সাহিত্য সব তাতেই নূতনের ছাপ আনব ভূদেব!

ভূদেব। পার্লেই ভাল।

গৌর। এখন খাবার দেওয়া হয়েছে, খাবে চল মধু, তর্ক পরে হবে।

মধু। ভূদেব আমার আর্য্য ঋষির বর্ত্তিবাহক।

ভূদেব। সেই কামনাই কর মধু! আমি যেন জীবনে আমার প্রণম্য আর্য ঋষিবৃন্দের মঙ্গল মন্ত্রই গান করে চলতে পারি।

তৃতীয় দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের গৃহ-কক্ষ

অমিয় ও প্যারীচরণ

প্যারী। খুব সাবধানে কথা কয়ো কিন্তু, কাকা যেন বুঝতে না পারেন, কাকীমার কানে ঘুণাক্ষরেও সন্দেহের কথা না প্রবেশ করে।

অমিয়। এত বড় নিমকহারামী কি ধর্ম্মে সইবে।

প্যারী। রেখে দাও তোমার ধর্ম্ম! এতবড় একটা সম্পত্তি ছেড়ে শেষকালে কি পথে পথে ঘুরব? না, তা হতেই পারে না। আমার কথা শুনে চলো। খুব সাবধান!

মধুসূদনের প্রবেশ

মধু। দাদা! দেখ দেখি বাবার কাণ্ডখানা কি?

প্যারী। কি ব্যাপার মধু?

মধু। এই দেখ না, কোথাকার কোন ঘোষ বংশ না মহাবংশ, তার মেয়েকে আমায় বিয়ে কর্ত্তে হবে। দেখলাম না, শুনলাম না, ধাঁ করে বিয়ে কর্ত্তে হবে। এই দেখনা সাহেবরা কেমন বিয়ের আগে মিলে মিশে তার পরে বিয়ে করে!

প্যারী। নিশ্চয়! ওরাই ত জগতের মধ্যে আজ সভ্য, ওদের আদর্শই যে সকল বড়লোক, বিদ্বান্ লোক, গণ্যমান্য সকলেই অনুকরণ কর্চ্ছে।

মধু। তুমিই বল না দাদা! বাবাকে একটু বুঝিয়ে, আমি এখন বিয়ে কর্ব্ব না।

অমিয়। ঠিকই ত! তোমার এমন আর কি বিয়ের বয়স হল। যাক না আরও কয়টা বছর। পড়াশুনা শেষ হোক।

মধু। তুমিই বল না বৌদি বুঝিয়ে!

অমিয়। নিশ্চয় বলব! তুমি এখন বিয়ের মত করো না। বিলেতে যাবে বলছিলে না?

মধু। নিশ্চয়!

প্যারী। তাই যাও ভাই। বিলেতে না গেলে কি মানুষ হওয়া যায়। আমাদের দেশের যত সব ঘোড়া গরু! হুঁ! একটা মানুষ আছে!

মধু। ওকথা কয়ো না দাদা! এদেশেও মানুষ ছিল, কবি কালিদাস, বাল্মীকি, ব্যাস কত বড় মহাকবি, তা কি আমরা চিনেছি!

প্যারী। তা ভাই বলতে পার! বড় বড় কবি ছিলেন বটে! তবে, তাঁরা তো স্বর্গে গেছেন অনেক আগে। এখন আর কি আছে?

মধু। তা সত্য! আমি বিলাত যাবই। কিছুতেই বিয়ে কর্ব্বো না এখন!

অমিয়। কখনই না। বিয়ে কর্লে কি আর মানুষ হওয়া যায়!

প্যারী। অর্থাৎ!

অমিয়। অর্থাৎ তুমি যা হয়েছ। পরের গলগ্রহ।

মধু। ওকথা আর কয়োনা বৌদি! তোমরা কি আমার পর!

অমিয়। ষাট্, ষাট্! পর হব কেন মধু! তুমি যে আমার বড় আদরের ভাই!

মধু। আমার জামাটা খুলে দাও না বৌদি! উঃ কি গরম! প্রাণ যে বেরিয়ে গেল।

অমিয়। এস ভাই! একটু হাওয়া করি।

প্যারী। তাই কর! আমি বাইরে ঘুরে আসি। দেখি কাকা এত বেলা কাছারী থেকে ফিরলেন কিনা।

রাজনারায়ণের প্রবেশ

রাজ। বুঝেছ প্যারী! তোমাকেও আমার সাথে যেতে হবে। বাঘুটে এমন আর বেশীদুর কি হবে।

প্যারী। না কাকা! এইত যশোর সহরের কয়েক মাইল দূরে, ভৈরব নদের তীরে।

রাজ। এ সপ্তাহে আমার অনেক কাজ জমে আছে, মক্কেল সব বসে আছে, আস্‌ছে সপ্তাহে যাব!

প্যারী। তাই হবে কাকা!

মধু। এ আপনি কি কইছেন দাদা!

প্যারী। না, না, তা, কাকা যা বলছেন!

মধু। না বাবা! আপনি মেয়ে দেখতে যাবেন না!

রাজ। নিশ্চয় যাব! তোমার কথা মত কাজ কর্ত্তে হবে নাকি? জাহ্নবী! জাহ্নবী! শুনছো তোমার গুণধর পুত্রের কথাটা! আমার মুখের উপর কথা! অপদার্থ! বাচাল!

অমিয়। ওমা! আমার হবে কি? এতটুকু ছেলে, সে কিনা আবার বাবার সামনে বিয়ের কথা কয়! আমাদের কালে এটা কি হবার যোটি ছিল!

মধু। বাবা!

রাজ। চুপরহ! বেয়াদপ! আমি তোমায় শাসন কর্ব্ব। ঘর থেকে বার হতে দেবো না। যত সব ম্লেচ্ছের সঙ্গে মিশে পরকালটা ঝর ঝরে করে তুলেছ! (ঘরের মধ্যে মধুকে লইয়া দরজায় চাবি দিলেন)

মধু। (ঘরের মধ্য হইতে) বাবা! বাবা!

রাজ। না, না, আমি তোমায় উচিত শিক্ষা দেবো। না খেতে দিয়ে আটকে রাখবো ঘরে!

জাহ্নবী দেবীর প্রবেশ

জাহ্নবী। একি কচ্ছ´ তুমি! আমার আদরের ছেলে ভয় পাবে যে!

(চাবি খুলিতে উদ্যত)

রাজ। না, তা হবে না। তোমার আব্দার আর চলবে না। উচিত শিক্ষা দেবো আমি মধুকে, দেখি বেয়াদপী সারে কি না।

জাহ্নবী। মধু! মধু!

মধু। (ঘরের মধ্য হইতে) মা! মা!

জাহ্নবী। যতসব অনাসৃষ্টি। আমার আর সহ্য হয় না! মাগো।

চতুর্থ দৃশ্য

রাজনারায়ণ দত্তের খাবার ঘর

লীলা, জাহ্নবী ও অমিয়

লীলা। না ঠাকুমা, আমি খাব না! মধুকাকা না খেলে আমি কিছুতেই খাব না। আমার খিদে নেই।

জাহ্নবী। আমারও খিদে নেইরে লীলা!

আমিয়। তাই কি হয়।

জাহ্নবী। কেন হবে না, আমার মধু না খেয়ে ঘরে বসে কাঁদছে, আর আমার মুখে অন্ন রুচবে।

অমিয়। লীলা! শিগ্‌গির খেয়ে নে, কাকাবাবু এখনি আসবেন।

লীলা। তা আসুন। আমি কিছুতেই খাব না, তা বলে রাখছি।

অমিয়। আঃ আদিক্ষেতা দেখ! খাব না, খাব না, কেন? কেন? কেন খাবিনে?

লীলা। আমি খাব না, মধুকাকা না খেলে আমি খাব না!

রাজনারায়ণের প্রবেশ

রাজ। কি খাবিনে লীলা!

লীলা। কাকা না খেলে আমি খাব না। তিনি ঘরের মধ্যে বসে, না খেয়ে কাঁদছেন, আর আমি খেয়ে নিশ্চিন্ত ঘুমুব; না, তা হবে না!

রাজ। তোর প্রাণটায় লাগছে লীলা! আর আমার প্রাণটায় লাগছে না, তোরা মনে করিস কি? বাপ মায়ের মন তোরা চিনবি কি করে রে! আগে দু'একটা ছেলে মেয়ে হোক তখন বুঝবি, সন্তানকে শাসন কর্লে মা বাপের প্রাণে কতখানি বাজে। তবু, করতে হয়। সন্তান অবোধরে লীলা! তাই বাপ মায়ের অবাধ্য হয়। দাও দেখি খেতে দাও। (খাইতে বসিয়া চুপ করিয়া রহিলেন)

জাহ্নবী। কই খাচ্ছ না যে।

রাজ। মধু আমার পাশে নেই, আমি কি খেতে পারি জাহ্নবী! যাও, তাকে নিয়ে এস! এত বেলা অভিমানে ছেলে আমার রাঙা হয়ে উঠেছে!

মধুসূদনের প্রবেশ

মধু। বাবা! আমার প্রণাম নিন্।

রাজ। খেতে বস মধু।

মধু। না বাবা! আমি খাব না, আমি চল্লুম।

রাজ। কোথায় যাবে?

মধু। যেথায় আমার প্রাণ চায়! আমি বন্দী হয়ে থাকতে পারব না বাবা! কিছুতেই পারব না। আমার প্রাণ চায় পাখীর মত মুক্ত হাওয়ায় ঘুরতে, ঘরের বাঁধন মানতে চায় না।

রাজ। মধু!

মধু। না বাবা আমায় ক্ষমা করুন!

জাহ্নবী। একী বলছ মধু! (মধুর হাত ধরিলেন)

মধু। মা! মা! আমায় বিদায় দাও মা আজ।

জাহ্নবী। মধু! বাবা! (মধু ঝড়ের বেগে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল)

পঞ্চম দৃশ্য

হিন্দু কলেজ প্রাঙ্গণ

কৃষ্ণ ও মধু

কৃষ্ণ। তোমায় কথা দিচ্ছি, তুমি খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ কর, নিশ্চয় তোমায় আমি বিলাত পাঠাব!

মধু। ডকৃটর করবীনও তাই বলছিলেন। তাঁদের কথায় বিশ্বাস করা যেতে পারে, কি বলেন?

কৃষ্ণ। নিশ্চয়! কত বড় ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তি এই করবীন!

মধু। তবে আমি খৃষ্টান হব, নিশ্চয় হব। আমি নিশিদিন সেই মহাকবিদেব পীঠস্থান দেখব বলে স্বপ্ন দেখছি। তাঁদের জন্মভূমির পবিত্রস্পর্শে আমিও প্রেরণা পেতে পারি।

কৃষ্ণ। মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা আগে, তার পরে কাজ। যার আশা নাই, তার কাজের প্রেরণা আসবে কোথা থেকে!

মধু। আগামী কালই দেখা কর্ব্ব আমি তাঁদের সঙ্গে। ফোর্ট উইলিয়মে যাব।

কৃষ্ণ। তাই যেয়ো! সকাল ৯টার মধ্যে যাবে।

(প্রস্থান

মধু। ধর্ম্ম মনের একটা ব্যাধি! মানুষ হতে হলে এ ব্যাধির হাত হতে দূরে থাকতে হবে।

ভূদেবের প্রবেশ

ভূদেব। কোন্ ব্যাধি বর্জ্জন কর্চ্ছ মধু।

মধু। তোমায় সে কথা কইলে তুমি ত হেসেই উড়িয়ে দেবে।

ভূদেব। এমন নিগূঢ় কথা কি থাকতে পারে তোমার ?

মধু। তা যা বলেছ, আমার আর কি গোপন কথা থাকতে পারে তোমায়। আমি স্থির করেছি খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্ব !

ভূদেব। তুমি ধর্ম্ম বিশ্বাস কর ?

মধু। একটুও না।

ভূদেব। তবে !

মধু। বিলাত যাবার খরচ দেবেন ডকটর করবীন ও কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, কথা দিয়েছেন। তাই।

ভূদেব। তাই তুমি পিতা মাতার পবিত্র সনাতন হিন্দু ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দেবে স্থির করেছ ?

মধু। হাঁ ভাই। আমি চাই হাউই বাজীর মত আকাশে উঠতে, আমার হৃদয় যেন প্রতিক্ষণে উপরে উঠ্তে চাইছে: তাকে আমি বশ কর্ত্তে পারছিনা। আমি পিতামাতার শাসন, তোমাদের মত মহতের নীতির বন্ধন, যেন মেনে চলতে পার্চ্ছিনা ! আমি মহাকবি সেকস্‌পীয়ার, ফ্রান্সের ভিকটর হুগো। ইটালীর কবিগুরু দান্তে এবং হোমার, ভার্জ্জিল টাসো, বায়রন প্রভৃতি মহাত্মাদের জন্মভূমি তাঁদের শিক্ষা সভ্যতার কেন্দ্রস্থল দেখতে চাই, বুঝতে চাই। ধর্ম্ম চাইনা !

ভূদেব। মধু ভাই ! আমার কথা শোন ! এমনটি করোনা, মা বাবার মনে কষ্ট দিয়ে প্রাণে শান্তি পাবে না, জীবনে উন্নতিও হয়ত হবে না। জীবনে উন্নতি লাভ কর্ত্তে হলে ভক্তি-ভাজনের আশীর্ব্বাদ চাই !

মধু। তোমার কথা শুনলে সত্যিই ভাই, আমি ভেবে যাই। কিন্তু, সে সামান্য একটু সময়ের জন্য।

জনৈক সহপাঠীর প্রবেশ

সহপাঠী। শিখ কাবাব এনেছি, খাবে মধুদা !

ভূদেব। ছিঃ ছিঃ ভদ্রলোকের ছেলে, অখাদ্য খাবার উপর এত লোভ কেন ?

মধু। তুমি এখন যাও। আমার বড় চিন্তার বিষয় আছে।

সহপাঠীর প্রস্থান

গৌরদাসের প্রবেশ

গৌর। মধু! তোমার বাবা আমাদের বাড়ীতে এসেছিলেন। তুমি নাকি তাদের না বলে, না খেয়ে চলে এসেছ বাড়ী থেকে ?

মধু। হাঁ, গৌর! আমি আর বাড়ী যাব না। আমায় তাঁরা খেতে না দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখতে চান। আমি বলছি, গেঁয়ো মেয়ে আমি বিয়ে কর্ব্ব না, তবু তাঁরা শুনবেন না। বাবার জিদ ত তুমি জান ?

গৌর। তোমার মায়ের মুখখানি মনে পড়লে সত্যিই আমার বড় কান্না পায় ভাই। তুমি চল আমার সঙ্গে।

মধু। না, না, তা হবে না, আমি যাব না ভাই। আমি আজই চল্লুম ফোর্ট উইলিয়মে, খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্ব। আর বাড়ীতে যাব না।

গৌর। সেকি ? তুমি কি পাগল হলে ?

মধু। হাঁ, আমার প্রাণ পাগল হয়ে উঠেছে। বিলাত যাবার জন্য। তাই, ডকটর করবীনের কথায় খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ কর্ব্ব।

গৌর। ধর্ম্মত্যাগ কর্ব্বে! কিন্তু, ভেবে দেখেছ কি, যে তার পরে তাঁরা তোমায় নাও পাঠাতে পারেন।

মধু। না, অতদূর ভাবিনি।

গৌর। সেটাও ভাবা উচিত !

মধু। মানুষকে বিশ্বাস কর্ত্তে পার্ব্ব না? যে মানুষ একটা সত্য জগৎ হতে এসেছেন—আমাদের দুয়ারে জ্ঞানের আলো বিলাতে।

ভূদেব। মধু তুমি ভুল কর্চ্ছ! আমাদের আর্য্য ঋষিরাজ জগৎকে প্রথমে ব্রহ্মতত্ত্বের আলোক দেখিয়েছিলেন।

মধু। কবি সেক্‌সপীয়রের মত মানুষ যে দেশে জন্মেছেন, সে দেশের লোককে এতটুকু বিশ্বাস আমি কর্ত্তে পারি ভূদেব! এখন তবে আসি।

প্রস্থান

গৌর তাইত ব্যাপার কি?

ভূদেব। শনিতে ধরেছে।

গৌর। শনি নয়, লক্ষ্মীর কোপদৃষ্টিতে পড়েছে। নহিলে—বাপের এত ঐশ্বর্য্য হেলায় বিসর্জ্জন দিচ্ছে।

ভূদেব। অদৃষ্ট!

ষষ্ঠ দৃশ্য

রাজনারায়ণের অন্তঃপুর

জাহ্নবী ও রাজনারায়ণ

জাহ্নবী। আমার মধুকে এনে দাও, আমি আর সইতে পারি না।

রাজ। আদর দিয়ে মাথায় তুলেছ, এখন কাঁদ্‌লে চলবে কেন, ফলটা ভোগ কর।

জাহ্নবী। তোমার দু'খানি পায়ে ধরি, আমার মধুকে আমায় এনে দাও।

রাজ। সাগরদাঁড়ীর দত্ত বংশের সন্তান, অখাদ্য খাবে, এ ভাবতেও পারিনি, তখনি বুঝে ছিলাম, এর গতি আরো বহুদূর!

জাহ্নবী। অখাদ্য খেয়েছে, প্রায়শ্চিত্ত কর্লে চলবে, আমার মধুকে ডেকে আন।

রাজ। অখাদ্য খেয়েছে! ধর্ম্মত্যাগ করে খৃষ্টান হয়েছে, তাকি শুনেছ?

জাহ্নবী। মাগো! আমি তোমার কথা আর সইতে পারিনা। পুরোহিত ঠাকুরকে সংবাদ দাও দেশে, প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্বেন।

রাজ। শুধু পুরোহিত নয়, সংবাদ দিয়েছি লেঠেলদেরও আসবার জন্য। দেখি আমার ছেলেকে কোন সাহেব বন্দী রাখতে পারে। প্যারী?

প্যারীর প্রবেশ

প্যারী। আজ্ঞে!

রাজ। কতজন লেঠেল এসেছে দেশ থেকে? ডাক দাও দেখি সর্দ্দারকে। কতবড় শক্তিমান ডাক্তার কর্‌বীন্। ফোর্টে লুকিয়ে রেখেছে আমার মধুকে—শঠ, জোচ্চোর! বৃথা আশায় লুব্ধ করে মধুকে খৃষ্টান করেছে। আমি একবার দেখে নেবো।

প্যারীর প্রস্থান

মধুকে আমি ফিরিযে আনব! আবার তাকে দেশে নিযে একশো আটটী মোষ বলি দেব; মা কালীর পাদপদ্মে। তবেই আমি রাজ-নারায়ণ দত্ত! আমার দাদা যা করেছিলেন একদিন, আমি তেমনি সমারোহ করে মায়ের পূজা দেবো। জাহ্নবী! তুমি মানত কর মহামায়ার পায়ে, দেখি, আমার বংশধরকে আমি ফিরে পেতে পারি কিনা।

অর্জ্জুন লাঠিয়াল সহ প্যারীর প্রবেশ

অর্জ্জুন। হুজুর পেরনাম হই!

রাজ। এসেছ অর্জ্জুন, এসেছ! আমার মান, সাগরদাঁড়ীর দত্ত-বংশের মান, যশোরের লাঠিয়ালদের মান রাখতে পার্ব্বে?

অর্জ্জুন। হুজুরের হুকুম হলি সবই পারি দেবতা!

রাজ। আচ্ছা! যাও, বিশ্রাম কর গিয়ে, আজ শেষ রাত্রে লুকিয়ে ঢুকতে হবে ফোর্টে, আমার মধুকে ছিনিয়ে আনতে হবে। তার জন্য যদি জান যায়, আমি আছি, তোমার সংসার দেখতে।

অর্জ্জুন। জানটার ডর করেনি কোনদিন এই অর্জ্জুন সর্দ্দার! বড় কত্তা যেদিন সোনার চরে জমি দখলের হুকুম দেলেন, সেদিন তো প্রাণটা হাতে করেই গিয়েলাম। জমিডে দখল কল্লাম, আর একটা ঘড়া খেলাত পালাম। আজও সে ঘড়াডা রয়েছে কত্তা! ছেলের গে কই, এই ঘড়াডা মানে ভরা, এর বেইমানী তোরা করিসনে কোনদিন, আর এই কত্তাগের কথা শুনে চলিস্। পেরনাম লাও, তবে, আসি। কাজ সাবাড় করে আলাপ কর্ব্ব!

প্রস্থান

জাহ্নবী। একটা খুনোখুনী কাণ্ড কর্ব্বে নাকি? এদের তুমি আন্‌লে কেন?

রাজ। এদের আনব না, তবে কাদের আনব? পুরোহিত! সেতো পরের কথা।

অমিয়র প্রবেশ

অমিয়। কি ঘেন্নার কথা মাগো! অখাদ্য খেয়ে, খ্রেষ্টান হল দত্ত বংশের মধু!

জাহ্নবী। তুমি মা চুপ কর! আর কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিতে হবে না।

অমিয়। যা বল, চুপই কর্লাম, কিন্তু সমাজ শুনবে কেন?

রাজ। সমাজ শুনবে কেন? সমাজকে টাকা দিয়ে শুনাব! আমার ছেলেকে ত্যাগ কর্ব্বে, কার ঘাড়ে কটা মাথা আছে দেখে নেবো।

প্রস্থান

লীলার প্রবেশ

লীলা। দিদিমা! রামায়ণ পড়ে শুনাব।

জাহ্নবী। হাঁ মা! তাই শুনাও!

লীলা। রামচন্দ্রের বনগমন অংশ পড়ব?

জাহ্নবী। না, মা, ওটা বাদ দাও।

লীলা। তবে কোথায় পড়ব?

জাহ্নবী। যেখানে ইচ্ছা পড়। আমার মনটা ভাল নেই

লীলা। (রামায়ণ পাঠ) সীতাহরণ।

দূরেতে রাক্ষস করে রাম তুল্য ধ্বনি।
রাক্ষসের মায়ায় রামের শব্দ শুনি।
হেথা সীতা শুনিলেন করুণ বচন।
বলিলেন, ঝাট যাও, দেবর লক্ষ্মণ।
আর্ত্তস্বরে শ্রীরাম ডাকেন হে তোমারে।
দেখ গিয়া তাঁহারে কি রাক্ষসেতে মারে।
লক্ষ্মণ বলেন, নাই শ্রীরামের ভয়।
মৃগ মারি আসিবেন কিসের বিস্ময়।

প্যারীচরণের প্রবেশ

প্যারী। কাকীমা মধু এসেছে।

জাহ্নবী। কোথায় মধু। তাকে ডাক দেখি।

প্যারীর প্রস্থান

লীলা। কাকা এসেছেন! কোথা দেখি।

মধুসূদনের প্রবেশ

মধু। মা!

জাহ্নবী। এসেছ বাবা! মাণিক এসেছ! এত রোগা হয়ে গেছ! ওরা কি যত্ন কর্ত্তে পারে?

মধু। বাবা দেখলে বক্‌বেন, এখনি যেতে হবে।

জাহ্নবী। না, মধু! তোমায় যেতে আমি দেবো না। হাঁরে মধু! আমার জন্য কি তোর মন একটুও কেমন করে না, প্রাণ কাঁদে না?

মধু। তুমি বুঝ্‌বে কি মা! আমি লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদি তোমার জন্য। কিন্তু আমি বিলাত যাব মা! বিলাত হতে এসে, তবে, তোমার কাছে রইব।

রাজনারায়ণের প্রবেশ

রাজ। কার কাছে রইবে মধু?

মধু। আমায় ক্ষমা করুন বাবা!

রাজ। তোমায় ক্ষমা কর্ব্ব। কুলাঙ্গার! তুমি কেন লুকিয়ে এসেছ! তোমায় ধরে আনব, তার জন্য দেশ থেকে অর্জ্জুন সর্দ্দারকে এনেছি।

জাহ্নবী। তুমি এখন চুপ কর। মধু খায়নি ক'দিন!

রাজ। মধু খায়নি! মধু খায়নি! কেন খায়নি সে? তার কিসের অভাব! আমার আদরের ছেলে মধু খায়নি। এও আমাকে শুনতে হল!

মধু। আমি ইংলণ্ড যাব। এই আশাতে খৃষ্টান হয়েছিলাম। এখন দেখছি যে আশা কুহকিনী মাত্র।

জাহ্নবী। তুমি প্রায়শ্চিত্ত কর মধু! আমার ঘরে আবার এসে ঘর আলো কর।

মধু। প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব? কেন কি পাপ করেছি আমি?

রাজ। কি পাপ করেছ? বাপ পিতামহের পবিত্র ধর্ম্ম ত্যাগ করে খৃষ্টান হয়েছ, ম্লেচ্ছ হয়েছ, আবার বলছ, কি পাপ করেছ? প্যারী?

প্যারীচরণের প্রবেশ

পুরোহিত ডেকে আন, ভূদেবকে ডেকে আন। মধুর প্রায়শ্চিত্তের সকল ব্যবস্থা কর।

প্যারী। কোন্ পুরোহিত ডাকব?

রাজ। কালীঘাটের পুরোহিত।

প্যারীর প্রস্থান

মধু। আমি কোন পাপ করিনি, যে প্রায়শ্চিত্ত কর্ব্ব।

রাজ। পাপ করনি! বংশের মুখ উজ্জ্বল করেছ! আমার সুপুত্র! যার জন্য সমাজে আমার মুখ দেখান ভার হয়েছে!

জাহ্নবী। ওঁর কথার উত্তর দিও না মধু!

মধু। তুমি যা বল মা সব শুনব, কেবল বিয়ে, আর ঐ প্রায়শ্চিত্তের কথা বাদে।

রাজ। বেরোও! আমার বাড়ী থেকে, বেয়াদপ, ষ্টুপীড্!

মধু। তাই যাচ্ছি বাবা! (প্রণাম করিতে উদ্যত)

জাহ্নবী। (হাত ধরিয়া) না, না, আমি তোমায় যেতে দেবো না মধু!

রাজ। হাজার বার যাবে! খৃষ্টান ছেলে রইবে আমার অন্দরে! বেরোও, এখনি বেরোও!

ধাক্কা দিয়া ঘরের বাহির করিয়া দিলেন

জাহ্নবী পশ্চাতে যাইতে উদ্যত

জাহ্নবী। মধু! মধু!

রাজ। (জাহ্নবীকে ধরিয়া) তোমার পুত্র নাই। মধু মরে গেছে!

জাহ্নবী। মাগো! (ক্রন্দন ও মূর্চ্ছা)

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

১০ বৎসর পরে

সময়—১৮৫৬ খৃঃ

মধুর বয়স—৩২ বৎসর

স্থান—মাদ্রাজ সহর। মধুসূদনের কক্ষ

মধুসূদন ও হেনরিয়েটা

মধু। আর একটু পরেই 'এথীনিয়ম' পত্রিকা আফিস থেকে টাকা আসবার কথা আছে।

হেন। টাকার জন্য ভাবছি না। তোমার মনের অবস্থাটার জন্য ভাবছি। এখানে এই ভাবে আর কত দিন চল্‌বে? এর চেয়ে বোম্বে, বা কলকাতা গেলে ভাল হত।

মধু। বোম্বে আমার কে আছে? কলকাতায় বরং অনেক বন্ধু বান্ধব আছে বটে। তাদের মধ্যে গেলে হয়ত প্রাণে একটু শান্তি পাব। গৌর পুনঃপুনঃ কলকাতা যেতে লিখ্‌ছে।

হেন। কিন্তু, তোমার এত ভাবনা কিসের? পত্রিকা ও সংবাদপত্র লিখে যা পাচ্ছ তাতে ত বেশ চলে যাচ্ছে। তবে Captive Ladie ছাপবার খরচটা এখনো বাকী আছে বটে।

মধু। শুধু যে বাকী আছে, তা নয়, তারা বিশেষ চাপ দিচ্ছে টাকাটা আজই চাই।

হেন। যদি এতই দরকার হয়, বাবার কাছ থেকে না হয় আর কিছু চেয়ে আনব।

মধু। না, তুমি আর চেয়ো না।

হেন। তবে, যা হয় আমিই ব্যবস্থা কর্ব্ব। কত টাকা দিতে হবে?

মধু। কত টাকা! ঘরে ত কিছুই নাই। আফিস থেকে যদি আসে, তবে হয়ত কিছু পেতে পারি।

লিলির প্রবেশ

মধু। (ব্যস্ত হইয়া) তুই এলি কোথা থেকে লিলি? আয় মা! বড় রোগা হয়ে গেছিস!

হেন। আমি তবে চল্লুম।

মধু। না, একটু দাঁড়াও! লিলিকে কিছু খেতে দোব?

হেন। আমার হাতে কিছুই নেই।

রাগতভাবে প্রস্থান

মধু। হারে লিলি! তোরা ভাল আছিস তো?

লিলি। হাঁ, বাবা, তুমি কেন যাওনা আমাদের বাড়ীতে? আমার মন কেমন করে, কিন্তু, মা আসতে দেন না এখন পথ দিয়ে যাচ্ছি, তাই তোমার কথা শুনে ছুটে এলাম। আর আমি যাব না বাবা!

মধু। (আর্ত্তস্বরে) যাবি না, যাবি না, কেন যাবি! আমার মেয়ে তুই, অথচ তোকে আমি রাখতে পারি না! কেন রাখব না, নিশ্চয়ই রাখব।

হেনরিয়েটার প্রবেশ

হেন। একটু দরকার আছে, তাই বাইরে যাচ্ছি।

মধু। তোমার হাতে ওটা কি? দেখি। (বাণ্ডিল খুলিয়া) না, বিয়ের গাউনটা তুমি বিক্রী করতে পারবে না। (দরজায় কড়া নাড়িতেই) ওই যা! এখন কি বলব ওদের, প্রেস থেকে টাকা নিতে এসেছে!

হেন। আমিই বলছি।

মধু। না, আমিই বলছি, তুমি ঘরে যাও।

দরজা খুলিতেই পিওন প্রবেশ করিল

পিওন। একটা পার্শ্বেল ও একটা ইন্‌সিওর আছে।

মধু। আছে! দেখি, দেখি, কোথা থেকে এসেছে। হাঁ, বাবা পাঠিয়েছেন টাকা, আর পার্শ্বেল পাঠিয়েছে গৌর। এ ইন্‌সিওর তুমি ফেরৎ দিও পিওন, আমি নেবো না।

হেন। ফেরৎ দেবে?

মধু। হাঁ ফেরৎ দেবো। বাবার টাকা নেবো কোন মুখে হেন্‌রিয়েটা?

পিওনের প্রস্থান

(পার্শ্বেল খুলিয়া) এই দেখ, রামায়ণ, মহাভারত, বাংলা অভিধান পাঠিয়েছে গৌর! আজ আমার বড় আনন্দ হচ্ছে সোফিয়া! এই বইখানা মা বড় পছন্দ কর্ত্তেন। রামায়ণ কি সুন্দর কাব্য! জগতে অনুপম।

লিলি। দেখি বাবা! কেমন বই!

মধু। লিলি! তোর—সেই গানটা মনে আছে, যা আমি শিখিয়েছিলাম—'যমুনা পুলিনে' মনে আছে?

লিলি। আছে বাবা!

মধু। তবে, একটু গা-না মা! আজ আমার মন এক অপূর্ব্ব আনন্দে সাড়া দিয়ে উঠ্‌ছে।

লিলি। (কোমল কণ্ঠে গান ধরিল, বাবা পিয়ানো বাজাইতে লাগিলেন)

গীত

যমুনা পুলিনে আমি ভ্রমি একাকিনী
হে নিকুঞ্জ বন!
না পাইয়া ব্রজেশ্বরে, আইনু হেথা সত্বরে।
হে সখে, দেখা দাও মোর ব্রজের রঞ্জন।
সুধাংশু-সুধার হেতু,
বাঁধিয়া আশার সেতু।
কুমুদিনীর মন যথা উঠেগো গগনে।
হেরিলে মুরলীধর ;
রূপে জিনি শশধর।
আসিয়াছি আমি দাসী তোমার সদনে।
তুমি হে অম্বর, কুঞ্জবর, তব চাঁদ
নন্দের নন্দন!

মধু। ওই যা! বাজারে ত কাউকে পাঠান হল না হেনরিয়েটা! এখন খাব কি?

হেন। আমিই যাচ্ছি।

মধু। না, না, একটু দাঁড়াও, দেখি প্রেস থেকে টাকা যদি আসে। (রামায়ণের পাতা উল্‌টাইতে উল্‌টাইতে) ওঃ মাই ডিয়ার হেনরিয়েটা! এই দেখ গৌরের পত্র। আর তার সঙ্গে Captive Ladie বিক্রয়ের আড়াইশ টাকার নোট। বাস্‌! দুর্ভাবনা গেল। প্রেসের টাকা দেবো, তোমার বাজার হবে, আর লিলির খাবার আসবে। বাস্‌! সব চুকে গেল। এখন তুমি বয়কে বাজারে পাঠাও, আমি গল্প করি, কবিতা লিখি!

হেনরিয়েটার প্রস্থান

লিলি। বাবা! আমি যাই! তুমি যেয়ো কিন্তু। তোমার জন্য আমার মন কেমন করে।

মধু। প্রাণের আর দোষ কি মা! আমার সন্তান তুই, তুই আমায় ছেড়ে থাকবি কেন? তোর মা কোথায় লিলি?

লিলি। তিনি বাড়ীতেই আছেন বাবা! আমায় ডাকছে আয়া, এখন যাই, আবার এসে খেয়ে যাবো।

মধু। যাবে? আবার আসিস্ মা।

মেয়েকে জড়াইয়া ধরিয়া চুমু খাইলেন। লিলি চলিয়া গেল, মধুসূদন দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া, নীরব রহিলেন। সহসা কড়া নড়িয়া উঠিল, দরজা খুলিলে কৃষ্ণমোহন প্রবেশ করিলেন

মধু। আসুন! আসুন! কবে এলেন মাদ্রাজ?

কৃষ্ণ। মিশনের কাজে এসেছি পরশু, সময় করতে পারিনি, তাই আসতে দেরী হল, কেমন আছ মধু? বিয়ে টিয়ে করেছ ত?

মধু। একটা নয়; দুই দুইটি বিয়ে করেছি। ছেলেমেয়েও হয়েছে।

কৃষ্ণ। প্রথমা পত্নী কতদিন মারা গেছেন?

মধু। মারা যাননি। রেবেকা ডিভোর্স করেছেন। তার জন্য মনঃকষ্টে আছি। এই একটু আগে তাঁর একটি মেয়ে এসেছিল, অথচ তাকে আমি রাখতে পার্লুম না। হিন্দুঘরে এটা হয় না, তাদের ডিভোর্স নাই কেন, এখন অনুভব কচ্ছি।

কৃষ্ণ। তাদের ডিভোর্স নেই, কিন্তু, তাদের মেয়েদের দুঃখ কষ্টের অবধি নেই।

মধু। দুঃখ কষ্ট নেই কার বলুন ত? যাক ওকথা, দেশের খবর কি?

কৃষ্ণ। তোমার Captive Ladie কাব্য, আর Vision of the Past বাঙ্গালীর প্রাণ স্পর্শ করেছে। সারা বাংলায় তোমার ধন্য ধন্য

রব উঠেছে। তোমায় তারা চায় মধু! তুমি দেশে চল! আমি এই সংবাদ জানতে এসেছি।

মধু। হাঁ, আমিও তাই ভাবছি। গৌর, মিঃ বেথুনের মত জানিয়েছে। এখানে যাঁরা প্রতিষ্ঠাবান্ ইংরেজ আছেন, তাঁরাও বলছেন—বঙ্গ-ভাষায় কাব্য রচনা করতে।

কৃষ্ণ। নিশ্চয়! তোমার প্রতিভা বাংলাভাষায় প্রতিষ্ঠা আন্‌বে মধু! তুমি চল!

মধু। আমি তাই ভাবছি! আমার প্রথমা পত্নীর সন্তানদের কাছ থেকে আমি দূরেই থাকতে চাই!

কৃষ্ণ। বিশপ কলেজের পর আর কি ভাষা শিখলে মধু!

মধু। এখানে তামিল, তেলেগু আর সংস্কৃত ভাষাটা আয়ত্ত করছি। পার্শী ও হিন্দুস্থানীরও চর্চ্চা করছি। আজ দেশ থেকে গৌর রামায়ণ, মহাভারত, আর বাংলা অভিধান পাঠিয়েছে। ভাবছি বাংলা লিখতে সুরু করব। আমার মা রামায়ণ বড় ভাল বাসেন, তাঁর কথা মনে হলে প্রাণ আমার বিষাদে আচ্ছন্ন করে তোলে। আমি মনে কচ্ছি রামায়ণ থেকে একটা কাহিনী বেছে নিয়ে কাব্য লিখব। তবু মায়ের স্মৃতি থাকবে!

কৃষ্ণ। তোমার মায়ের মৃত্যুতে আমরা মর্ম্মাহত হয়েছি মধু!

মধু। মায়ের মৃত্যু হয়েছে? কবে, কবে?

কৃষ্ণ। একমাস হয়েছে, সংবাদ পাওনি? আজ, তবে, আমি আসি মধু, কাল আবার দেখা হবে।

প্রস্থান

মধু। হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা!

হেনরিয়েটার প্রবেশ

শুনেছ আমার মা, আমার সর্ব্বস্ব, আর নেই! তাঁর অন্তিম সময়েও আমি তাঁর পাশে থাকতে পার্লুম না! এমনি হতভাগ্য আমি! মা! মা! (ক্রন্দন)

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাজনারায়ণের অন্তঃপুর কক্ষ

জাহ্নবী দেবীর চিত্র পুষ্পপত্রে সজ্জিত

সময়—১৮৫১ খৃঃ

রাজনারায়ণ অশ্রু ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ছবির পানে চাহিয়া আছেন

রাজ। জীবন্ত ছবি এঁকেছে। এমন না হলে—আর্টিষ্ট! চোখের কোণে এখনো যেন দু'ফোঁটা জল জমে আছে। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে যার জীবন গিয়েছে, তার চোখে এমন করুণ দৃষ্টি ফুটে না উঠ্‌লে স্বাভাবিক হবে কেন! কিন্তু, তবু মধু এল না! প্যারী?

প্যারীচরণের প্রবেশ

রাজ। কত দাম নিয়েছে আর্টিষ্ট?

প্যারী। আজ্ঞে, আড়াইশ টাকা।

রাজা। মোটে আড়াইশ টাকায় এমন একখানা নিখুঁত অয়েল পেন্টিং তুমি আনতে পার? ঠকিয়েছ তাকে। এ তোমার বড় অন্যায়।

প্যারী। আজ্ঞে না, এই দামই চেয়েছিল।

রাজ। মিথ্যা কথা! তুমি কম ঘুঘু নও। যাও, আরও একশ টাকা তাকে দিয়ে এস, রসীদ এনো বুঝলে!

প্যারী যাইতে উদ্যত

দাঁড়াও! মধুর লেখা সেই বই—Captive Lady ক'খানা এনেছ?

প্যারী। একখানা।

রাজ। অপদার্থ! কে তোমায় বলেছে মাত্র একখানা আনতে?

প্যারী। আজ্ঞে আপনি।

রাজ। আমি! কখনই নয়। আমার একমাত্র ছেলে, বংশের প্রদীপ, মধুর লেখা এমন সুন্দর বই, এই মাত্র একখানা কিনতে বলেছি, এ তোমার মনগড়া কথা।

প্যারী। ক'খানা আনব?

রাজ। যে ক'খানা পাও, সব কিনে আনবে। বাজার খুঁজে বার করবে কোন দোকানে কত খানা আছে। মধু আমার দেওয়া টাকা ফেরৎ দিয়েছে, অভিমান করে ফেরৎ দিয়েছে, ছেলে মেয়ে নিয়ে অভাবের তাড়নায় শুনছি দেনা করছে। এমন একখানা বই লিখলো, তাও বিক্রী হচ্ছে না, বাঙ্গালী গুণের আদর বুঝবে কোথা থেকে! তার আছে সম্বল হিংসা! আপনার জনের উন্নতি সে দেখবে কেমন করে! নইলে, এতবড় একটা মস্তিষ্ক-ওয়ালা জাতির উন্নতি নেই কেন? যাও, সব বই কিনে নিয়ে এস, শীঘ্র যাও!

প্যারী যাইতে উদ্যত

শোন! দু'খানা বই বাঁধিয়ে এনো, সোনার পাতে মুড়ে নিয়ে এস, একখানা আমার।

প্যারী। আর একখানা ?

রাজ। আর একখানা জাহ্নবীর ছবির পাশে সাজিয়ে রাখব। তাঁর ছেলে বই লিখেছে, বড় পণ্ডিত হয়েছে, আর সে তা দেখে যেতে পার্ল না। এ দুঃখ আমার মর্লেও ঘুচবে না। তার প্রাণ মধু, মধু করেই বেরিয়ে গেল! (আর্ত্তস্বরে) জাহ্নবী! জাহ্নবী! তুমি কি আমার এ পাষাণ প্রাণের যাতনা বুঝতে পার্চ্ছ! বুঝতে পার্চ্ছ!

প্যারী। কাকা!

রাজ। চুপ কর! আমার এ মোহ ভেঙ্গে দিয়ো না প্যারী।

প্যারী। আমি চল্লুম বাইরে।

রাজ। যাও. কিন্তু ফিরে এস ; মধুর মত করো না।

প্যারীর প্রস্থান

পশ্চাৎ দিক হইতে মধুর প্রবেশ

মধু। বাবা!

রাজ। কে ? কে ? কার কণ্ঠস্বর ?

মধু। বাবা! আমি এসেছি।

রাজ। এসেছিস্, এসেছিস্, আমার মধু আবার এসেছিস্! আয়, আয়, আমার আরো কাছে আয়। দেখ্, দেখ্, ঐ তোর মায়ের ছবি। দেখছিস্, এখনো তোর জন্য তাঁর চোখের কোণে জল ঝরছে!

মধু। মা! মা!

রাজ। কোথায় তোর মা! তাঁর প্রাণ পাগল করা করুণ ক্রন্দন ধ্বনি যে আজিও আমার প্রাণে বাজছে। 'ওগো আমার মধুকে এনে দাও।'

মধু। বাবা!

রাজ। কি মধু!

মধু। আপনাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।

রাজ। মাত্রাজে নিয়ে যেতে এসেছ! কিন্তু, বড় দেরী হয়ে গেছে পুত্র! আমি আবার বিয়ে করেছি।

মধু। তবু তোমায় যেতে হবে, তোমার যত্ন তারা কেমন করে বুঝবে বাবা।

রাজ। আমার যত্ন! না মধু আমি আর যত্ন চাই না। কাউকে আর যত্ন কর্ত্তে বলি না। এখন যেতে পার্লেই বাঁচি।

মধু। না বাবা! তা হবে না! আমি তোমাকে নিয়েই যাব।

রাজ। ভুলে যাচ্ছ মধু, আমি সাগরদাঁড়ীর দত্ত বংশের সন্তান। খৃষ্টানের সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকতে নেই।

মধু। বাবা!

রাজ। এই আমার শেষ উত্তর পুত্র!

মধু। তবে আমি কি কর্ব্ব!

রাজ। আমার এই পাঁচ হাজার টাকা নাও, তোমার মায়ের ইচ্ছা। তোমার কষ্ট দেখলে, তার স্বর্গেও শান্তি হবে না।

মধু। না বাবা! আমি টাকা চাই না, চাই তোমার স্নেহ।

রাজ। স্নেহ! এই জ্বালাময় বুকের মধ্যে এতটুকুও স্নেহ অবশিষ্ট নাই মধু! যাও, যাও, তোমার মায়ের আত্মার আর অপমান করো না!

মধু। বাবা!

রাজ। হাঁ, খৃষ্টানের স্থান নাই এই ঘরে। এ পবিত্র মন্দির। তার অপমান করো না।

মধু। তবে, যাই পিতা! প্রয়োজন হলে সংবাদ দেবেন।

প্রস্থান

রাজ। প্রয়োজন! (অট্টহাস্য)

প্যারীর প্রবেশ

প্যারী। কাকা! কে গেল, মধু না?

রাজ। হাঁ মধু, হাঁ মধুই বটে! কিন্তু, তাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছি।

প্যারী। এ আপনি কি কর্লেন কাকা। আমি ওকে ডেকে আনি।

যাইতে উদ্যত

রাজ। (প্যারীকে ধরিয়া) চুপ রহ। রাজনারায়ণ দত্তের সঙ্গে খৃষ্টানের কোন সম্বন্ধ থাকতে নেই।

তৃতীয় দৃশ্য

কলিকাতা। ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড।

মধুসূদনের লাইব্রেরী কক্ষ

মধু। হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি।
(দরজার বাহিরে—আমি আস্‌তে পারি?)
কে, গৌর! এস।

গৌরদাস বসাকের প্রবেশ

এই দেখ গৌর! কেমন সুন্দর একটী কবিতা লিখেছি। মনে কচ্ছি, এবার হতে বাংলায় লিখব।

গৌর। নিশ্চয়! তোমায় আমি জানাতে এসেছি, তুমি বরং বাংলায় নাটক লেখ! রাজা দিগম্বর মিত্র আমায় এই কথা জানাতে

বলেছেন! রত্নাবলীর মত বাজে নাটকের পিছনে কত টাকা যে জলের মত খরচ হয়ে গেল!

মধু। রাজা বলেছেন, অল্ রাইট্, আমি দেখা করব তাঁর সাথে। রাজকৃপা না হলে, কবি বাঁচবে কি করে। কাব্য যে সৃষ্টি কর্বে তার দায়িত্ব নেবেন রাজা। এইত ছিল, অতীত ভারতে, সভ্যতার সুবর্ণযুগে। তাই, কবি কালিদাসের আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। এখন আমার কবিতাটা শোন।

গৌর। বেশ পড়।

মধু। হে বঙ্গ! ভাণ্ডারে তব বিবিধ রতন,
তা সবে, (অবোধ আমি) অবহেলা করি,
পর ধন লোভে মত্ত, করিনু ভ্রমণ,
পর দেশে। ভিক্ষা বৃত্তি কুক্ষণে আচরি।
কাটাইনু বহুদিন সুখ পরিহরি
অনিদ্রায়, অনাহারে যপি কায় মন,
মজিনু বিফল তপে অবরেণ্যে বরি,
ফেলিনু শৈবালে ভুলি কমল কানন!
স্বপ্নে তব কুললক্ষ্মী কযে দিলা পরে,
"ওরে বাছা, মাতৃকোষে রতনের রাজি,
এ ভিখারি-দশা তবে কেন তোর আজি?
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে!"
পালিলাম আজ্ঞা সুখে, পাইলাম কালে
মাতৃভাষা রূপ খনি, পূর্ণ মণি জালে।

গৌর। চমৎকার! এবার কবি আমার বঙ্গ ভারতীর পূজারী! এইত চাই!

মধু। গৌর! এবার—

রচিব মধু-চক্র, গৌড় জন যাহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

গৌর! শুনেছ! তোমার বৌদিও মাদ্রাজ থেকে এসেছেন!

গৌর। তাই নাকি। তাহলে এবার তুমি রীতিমত গৃহস্থ! তোমার উপর একটা ভার দেবো বলে এসেছি। নাটক ত রচনা কর্ব্বে, তোমার পছন্দ মত বিষয় নির্ব্বাচন করে নিয়ে, আর রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদ কর্ব্বে। এর জন্য পাঁচশত টাকা পারিশ্রমিক পাবে। ইংরাজরা যাতে রত্নাবলীর মর্ম্ম বুঝতে পারে, তার জন্য অনুবাদটা দরকার হয়েছে!

মধু। আনন্দে আমার নাচতে ইচ্ছা কর্চ্ছে ভাই গৌর! দি গ্রেট ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্! বস ভাই! একটু গরম চা, আর মামলেট অর্ডার দিয়ে আসি। বয়, বয়!

হেনরিয়েটার প্রবেশ

এই যে গৌর! তোমার বৌদি স্বয়ং এসেছেন, স্বয়ং যখন অন্নপূর্ণা হাজির, তখন শুধু মামলেট আর হবে না, চপ্, কাটলেট্ নিশ্চয় আসবে।

হেনরিয়েটা। আমায় আর লজ্জা দাও কেন গৌরবাবুর সামনে! তুমি যেমন মহাদেব! সদা ভোলানাথ, কবিতায় তন্ময়, আমিও তেমনি অন্নপূর্ণা ঘর শূন্যা!

মধু। হ্যাঃ, তাই নাকি! সব কবিত্ব নষ্ট করে দিলে হে, হেনরিয়েটা! তোমার একটুও বুদ্ধি নেই! গৌর! দাও তো পাঁচটা টাকা, কাল পাবে।

হেন। না, না, তা হবে না, আমি ব্যবস্থা কর্চ্ছি, তোমার যেমন কথা।

মধু। তাতে হয়েছে কি? গৌর কি আমার পর। ও যে আমার প্রাণ, আমার আত্মা! মাই ডিয়ার হেন্‌রিয়েটা! ওঃ ভুল হয়ে গেছে। এই আমি বসলুম। আমার কবিতা শোন গৌর। ওই অন্নপূর্ণা একটা ব্যবস্থা নিশ্চয় কর্বেন।

গৌর। এই নাও বৌদি—রত্নাবলী নাটকের ইংরাজী অনুবাদের ভার দিচ্ছি মধুকে, তাই রাজা পাঁচশত টাকা আগাম দিয়েছেন। তুমিই নাও। মধুর যা দরাজ হাত, দু'দিনেই সব ফুঁকে দেবে।

মধু। আমার ফ্রেণ্ড! অথচ আমায় বিশ্বাস কর্লে না। এটা তোমার বড় বেশী পক্ষপাতিত্ব গৌর! বেশ, তবে শোন কবিতা। চুপ করে শোন। চপ্ কাটলেট, চা আসছে! একগ্লাস খাবে।

হেনরিয়েটার প্রস্থান

গৌর। না, এখন থাক।

মধু। বেশ শোন তবে।

গৌর। ও এখন থাক। তোমার "মেঘনাদ বধ" কাব্যটা শীঘ্র আরম্ভ কর।

মধু। সব স্থির করে ফেলেছি। আরম্ভ শীঘ্র করব। আমার চোখের উপর তাই, স্বর্ণলঙ্কার ছবি ভেসে উঠ্‌ছে।

গৌর। তাই কর, কোন কাজ ফেলে রাখলে আর হয় না। বাধা বিঘ্নের অভাব নেই।

মধু। তাই কর্ব্ব। তোমার আর বিদ্যাসাগরের উৎসাহ আমাকে উন্নতির সোপানে নিয়ে চলেছে ভাই।

গৌর। কোন ছন্দে লিখবে স্থির করেছ?

মধু। অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করব!

(চা ও খাবার আসিল, উভয়ে খাইতে খাইতে)

গৌর। আর একটা কথা। আগামী মাসে তোমার নাটক আমরা প্লে করতে চাই।

মধু। নিশ্চয় পাবে! আমার "মেঘনাদ বধ" কাব্যকেও নাটক করে অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে পার্ব্বে।

গৌর। তা হলে আরো নূতনত্ব হয় ভাই। রাজারা অবাক হয়ে যাবেন!

মধু। সবাইকে আমি অবাক কর্ব্ব ভাই।

গৌর। এখন তবে আসি, আবার কাল দেখা হবে। গুড বাই!

প্রস্থান

মধু। গুড বাই!

(প্যারী, লীলা ও অমিয় প্রবেশ করিল)

আসুন দাদা! বৌদি আসুন! লীলা এত বড়টী হয়েছিস্!

লীলা। কাকা! তুমি এতদিন এসেছ, অথচ আমাদের সঙ্গে দেখাই কর্লে না।

মধু। তা ঠিকই বলেছিস্। আমার আর ও বাড়ীতে ঢুকতে ইচ্ছা নাই, মা বাবা নেই, মনে হলে আমার প্রাণ কেঁদে ওঠে! ও বাড়ীর প্রতিটি জিনিষ বাবার স্মৃতি দিয়ে ঘেরা, তাই যাইনি।

প্যারী। এখন না গেলে ভাল দেখায় কি মধু! তোমার ছোট মা আছেন। আমরা আছি। কাল একবার যেয়ো মধু।

অমিয়। হলেই বা খৃষ্টান! তবু বাড়ীর লোক ত। বাড়ীতে না থাকলেই হল, দেখা করে চলে এস! বুঝেছ?

মধু। আচ্ছা! সময় হলে একবার যাবার চেষ্টা কর্ব্ব। লীলা, তোর গানের কিছু উন্নতি হয়েছে?

লীলা। তোমার ব্রজাঙ্গনার একটি গান শিখেছি, কেমন হয়েছে শুনবে?

মধু। তাই নাকি ? আমার ব্রজাঙ্গনার গান তোমাকে কে শিখাল ? নিশ্চয় শুনব, আমার গান – তুমি গাইবে, এর চেয়ে আর আছে কি জীবনে ! শুনছো ! শুনছো ! হেনরিয়েটা ! শুনছো ! আমার ভাইঝি লীলা, আমার ব্রজাঙ্গনার গান গাইবে, শীঘ্র এস ! এই যে পিয়ানো, গাও।

হেনরিয়েটার প্রবেশ

এই আমার দাদা, এই বৌদি, এই লীলা ! নাও, এখন গান শোন ! লীলা গাইবে ! ওর গলা বড় মিষ্টি হেনরিয়েটা ! ওর মনটাও ভাল যে ! ওই ত আমার মাকে, আমাকে রামায়ণ পড়ে শুনাত ! সেকথা মনে হলে……যাক্। এখন গান কর।

লীলা। (মধুর কণ্ঠে গাহিল)—

ফুটিল বকুল ফুল কেন গো গোকুলে আজি
কহ তা, স্বজনি।
আইলা কি ঋতুরাজ ?
ধরিলা কি ফুল সাজ
বিলাসে ধরণী ?
মুছিয়া নয়ন জল, চললো সকলে চল।
শুনিব তমাল তলে বেণুর সুরব,
যাইল বসন্ত যদি, আসিবে মাধব।

প্যারী। আমরা আজ আসি ! তুমি যেয়ো মধু। বাড়ীতে কাকীমা একা রয়েছেন।

হেন। না, খেয়ে যাবেন, একটু বসুন, আনছে চা !

অমিয়। খেষ্টান বাড়ীতে আমি খাব ! ও ঘেন্না ! আমি যাই।

মধু। হেনরিয়েটা! ক্ষুব্ধ হয়ো না। এটা আমার প্রাপ্য। তাই এরা এসেছিলেন, আমি ত ডেকে আনিনি!

প্যারী। যতসব বাজে কথা! তুমি মধু! বৌমা! ওর কথায় কান দিয়ো না। গ্রাম্য অশিক্ষিতা, ওর আর কত জ্ঞান হবে! চল খিদিরপুর যেতে অনেক সময় লাগবে।

লীলা। কাকীমা! আমায় ভুলো না। একা আসতে পারি না, নইলে রোজই আসতাম।

হেন। এস মা। আবার দেখা হবে।

মধু। তাই আসিস্ লীলা! সেই রামায়ণ প্রণামের কথা আমার আজও মনে পড়ে।

চতুর্থ দৃশ্য

দিগম্বর মিত্রের নাট-মন্দির

মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, গৌরদাস, মনোমোহন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি

বিদ্যাসাগর। সত্যি বলছি মধু, তোমার "ব্রজাঙ্গনা" কাব্য আমার মধুর চেয়েও মিষ্টি লাগে।

বঙ্কিম। কোন মধু? চাকের মধু, না আমাদের মধুবাবু!

বিদ্যা। তুই-ই আমার কাছে বড় মিষ্টি বঙ্কিম।

মধু। সাগর আমায় সত্যি ভালবাসেন, তাই, ওর কাছে আমার সব কিছু মধুর মনে হয়।

বিদ্যা। তোমার "মেঘনাদ বধ" কাব্যও সুন্দর। কিন্তু ঐ দাঁতভাঙ্গা ছন্দ, আর অত উপমার অরণ্য ভেদ করে আমি তার সুরভিত কুসুম আহরণ করতে পেরে উঠি না।

গৌর। তাইত, আপনার মত মতই "মেঘনাদ বধ" কাব্য নাট্যাকারে রূপান্তরিত করেছি। আর সেই নাটকের অভিনয় এখনই হবে।

বঙ্কিম। সত্য বলেছেন গৌরবাবু! কোন উপন্যাস যখন কেউ পড়ে একরকম, আর ত' যখন নাটকাকারে অভিনয় হয় তখন শত শত লোক যুগপৎ তার রস গ্রহণ করে তৃপ্তি পায়।

ভূদেব। কিন্তু, নাটক—নাটক; কাব্য—কাব্য। কাব্যের অলঙ্কার, উপমা অভিনযে বাদ পড়বে ত?

গৌর। তা পড়বে, কিন্তু, সহজে বুঝতে পার্ব্বেন, আর মনের উপর সুস্পষ্ট চিত্র ভেসে উঠ্‌বে!

মনো। আজ "মেঘনাদ বধ" কাব্য অভিনয় হোক, আর এক দিন "ব্রজাঙ্গনা" এমনি অভিনয় আয়োজন কর গৌর। তার খরচ আমিই বহন কর্ব্ব।

বিদ্যা। মনোমোহন দেখছি বিদ্যোৎসাহী। এটা জাতির উন্নতির সোপান। আমাদের এই সাহিত্য গোষ্ঠী মৃত্যুঞ্জয়ী হয়ে রইবে বঙ্কিম।

বঙ্কিম। আপনার আশীর্ব্বাদ বৃথা হতে পারে না। আপনি বাংলার মুকুটমণি!

বিদ্যা। অত উপরে উঠিয়োনা বঙ্কিম! তোমরা বাঙ্গালী ওঠাতে জান, আবার যখন কেউ ওঠে, তখন নামাতেও ওস্তাদ!

বঙ্কিম। কিন্তু, আপনাকে নামাবার শক্তি কোন বাঙ্গালীর হবে না।

মনো। এই দেখনা, মধুর সুখ্যাতি করছি আমরা, আবার পণ্ডিতের দল বলছেন—মেঘনাদ কি একটা কাব্য, ওতেতো কেবলই ভুল, আর ভুল, যেন কিছুই না!

বঙ্কিম। উড়িয়ে দিলেই হিমালয় পর্ব্বতটা উড়ে যায় না। তার মহিমা যুগ যুগ ধরে ভারতবর্ষকে গৌরবমণ্ডিত করে রেখেছে, রাখবে। মধুবাবুর কাব্য মেঘনাদ বধও তাই হবে।

গৌর। এখন অভিনয় আরম্ভ হচ্ছে, আপনারা অভিনিবেশ সহকারে দর্শন ও শ্রবণ করুন।

মধু। আর আমাকে কৃতার্থ করুন।

রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হইল।

মেঘনাদ নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে মন্ত্রপাঠ করিতেছেন, সম্মুখে যজ্ঞ-অগ্নিপ্রজ্বলিত। মেঘনাদের উন্নত ললাটে উজ্জ্বল রক্তচন্দন তিলক, দেহ চন্দনচর্চ্চিত, রক্তবর্ণ বসন ও উত্তরীয় শোভা পাইতেছে, মেঘনাদ মন্ত্রপাঠ করিয়া ঘৃতাহুতি দিলেন

"তেজোঽসি তেজো ময়ি ধেহি।
বীর্য্য মসি বীর্য্যং ময়ি ধেহি।
বল মসি বলং ময়ি ধেহি।
ওজোঽস্যোজো ময়ি ধেহি।

সহসা লক্ষ্মণ যোদ্ধৃবেশে যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া মেঘনাদ অগ্নিদেবরূপে ভুল করিলেন, প্রণাম করিয়া কহিলেন—

মেঘ। হে বিভাবসু! শুভক্ষণে আজি
পূজিল তোমারে দাস, তেই প্রভু, তুমি
পবিত্রিলা লঙ্কাপুরী ওপদ-অর্পণে।
কিন্তু কি কারণে, কহ, তেজস্বি আইলা
রক্ষঃ কুলরিপু নর লক্ষ্মণের রূপে
প্রসাদিতে এ অধীনে? একি লীলা তব,
প্রভাময়?

মেঘনাদ পুনরায় লক্ষ্মণকে প্রণাম করিলেন

লক্ষ্মণ। নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে।
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে
আগমন হেথা মম; দেহরণ মোরে
অবিলম্বে।

মেঘ। সত্য যদি তুমি
রামানুজ, কহ রথি, কি ছলে পশিলা
রক্ষোরাজ পুরে আজি? রক্ষঃ শত শত,
যক্ষপতি ত্রাস বলে, ভীম অস্ত্র পাণি,
রক্ষিছে নগর দ্বার; শৃঙ্গধর সম
এ পুর প্রাচীর উচ্চ, প্রাচীর উপরে
ভ্রমিছে অযুত যোধ চক্রাবলীরূপে,
কোন মায়া বলে, বলি, ভুলালে এ সবে?
মানব কুল সম্ভব, দেবোকুলোদ্ভবে
কে আছে রথী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রণে
একাকী এ রক্ষো বৃন্দে? এ প্রপঞ্চ তবে
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে,
সর্ব্বভুক? কি কৌতুক এ তব কৌতুকি?
নহে নিরাকার, দেব, সৌমিত্রি, কেমনে
মন্দিরে পশিবে সে? এখনো দেখ
রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভু, দেহ এ কিঙ্করে,
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিব রাঘবে
আজি, খেদাইব দূরে কিষ্কিন্ধ্যা অধিপে,
বাঁধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে—
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাচিছে চৌদিকে

শৃঙ্গ, শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি,
ভগ্নোত্তম রক্ষঃ চমূ, বিদাও আমারে!

লক্ষ্মণ। কৃতান্ত আমি রে তোর, দুরন্ত রাবনি!
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে!
মদে মত্ত সদা তুই, দেব বলে বলী,
তবু অবহেলা, মূঢ়, করিস সতত
দেব কুলে! এতদিনে মজিলি দুর্ম্মতি!
দেবাদেশে রণে আমি আহ্বানি রে তোরে।

(লক্ষ্মণ অসি কোষমুক্ত করিলেন)

মেঘ। সত্য যদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু
লক্ষ্মণ, সংগ্রাম সাধ অবশ্য মিটাব
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু
রণ রঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা,
তিষ্ঠ, লহ, শূর শ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে।
সাজি বীর সাজে আমি। নিরস্ত্র যে অরি,
নহে রথি কুলপ্রথা আঘাতিতে তারে
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে,
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে, কি আর কহিব?

লক্ষ্মণ। আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি,
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে
তোর, ক্ষত্রধর্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে।

মেঘ। ক্ষত্রকুল গ্লানি, শত ধিক তোরে,
লক্ষণ! নির্লজ্জ তুই! ক্ষত্রিয় সমাজে
রোধিবে শ্রবণ পথ ঘৃণায়, শুনিলে
নাম তোর রথিবৃন্দ! তস্কর যেমতি
পশিলি এ গৃহে তুই, তস্কর সদৃশ
শাস্তিয়া নিরস্ত তোরে করিব এখনি!
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে,
ফিরি কি সে যায় কভু আপন বিবরে,
পামর? কে তোরে হেথা আনিল দুর্ম্মতি?

মেঘনাদ কোষা তুলিয়া লক্ষ্মণের শিরে আঘাত করিতেই লক্ষ্মণ ভূমিতলে পড়িয়া গেলেন, তাঁহার অসি কোষমুক্ত করিতে চেষ্টা করিল, মেঘনাদ কিন্তু পারিল না, ধনু ও বাণ লইবার চেষ্টা করিল পারিল না, তখন হতবুদ্ধি মেঘনাদ অসহায় ভাবে দ্বার পানে চাহিল, দেখিল তথায় বিভীষণ দাঁড়াইয়া আছেন, তখন বিষাদভরে কহিল—

মেঘনাদ। (এতক্ষণে)
জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব
এ কাজ, নিকষা সতী তোমার জননী
সহোদর রক্ষঃ শ্রেষ্ঠ? শূলি শম্ভুনিভ
কুম্ভকর্ণ, ভ্রাতৃপুত্র বাসব বিজয়ী,
নিজ গৃহ পথ, তাত, দেখাও তস্করে?
তস্করে বসাও আনি রাজার আলয়ে?
কিন্তু, নাহি গঞ্জি তোমা, গুরুজন তুমি
পিতৃতুল্য! ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে,

পাঠাইব রামানুজে শমন ভবনে,
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঞ্জিব আহবে।

বিভীষণ বৃথা এ সাধনা
ধীমান! রাঘবের দাস আমি, কি প্রকারে
তাঁহার বিপক্ষ কাজ করিব রক্ষিতে—
অনুরোধে?

মেঘ। হে পিতৃব্য তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে!
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে!
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে,
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
ধূলায়? হে রক্ষো রথি, ভুলিলে কেমনে
কে তুমি? জনম তব কোন মহাকুলে?
কে বা সে অধম রাম! স্বচ্ছ সরোবরে
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ কাননে,
যায় কি সে কভু, প্রভু, পঙ্কিল সলিলে,
শৈবাল দলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী
কবে হে বীর-কেশরি, সম্ভাষে শৃগালে
মিত্রভাবে? অজ্ঞদাস, বিজ্ঞতম তুমি,
অবিদিত নহে কিছু তোমার চরণে।
ক্ষুদ্র মতি নর, শূর লক্ষ্মণ, নহিলে
অস্ত্রহীন যোধে কিসে সম্বোধে সংগ্রামে!
কহ, মহা রথি, এ কি মহারথি প্রথা?
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে
একথা! ছাড়হ দ্বার আসিব ফিরিয়া

এখনি! দেখিব আজি কোন দেব বলে
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি!
দেব-দৈত্য-নর রণে, স্বচক্ষে দেখেছ,
রক্ষ-শ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের, কি দেখি
ডরিবে এ দাস হেন দুর্ব্বল মানবে?
নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে প্রগলভে পশিল
দম্ভী, আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে!
তব জন্মপুরে তাত পদার্পণ করে
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন কাননে
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য? প্রফুল্ল কমলে
কীটবাস? কহ তাত, সহিব কেমনে
হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃপুত্র তব?
তুমিও হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?

বিভীষণ। নহি দোষী আমি, বৎস! বৃথা ভর্ৎস মোরে,
তুমি! নিজ কর্ম্ম দোষে, হায়, মজাইলা
এ কনক লঙ্কা, রাজা মজিলা আপনি।
বিরত সতত পাপে দেব কুল, এবে,
পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী, প্রলয়ে যেমতি
বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কাল সলিলে!
রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী
তেঁই আমি! পর দোষে কে চাহে মজিতে?

মেঘ। ধর্ম্মপথ গামী,
হে রাক্ষস রাজানুজ, বিখ্যাত জগতে
তুমি, কোন ধর্ম্মমতে, কহ দাসে, শুনি,
জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি, এ সকলে দিলা

জলাঞ্জলি ? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্ যদি
পর জন, গুনহীন স্বজন, তথাপি
নির্গুন স্বজন শ্রেয়ঃ পরঃ পরঃ সদা।
এ শিক্ষা হে রক্ষোবর! কোথায় শিখিলে ?
কিন্তু, বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে
হে পিতৃব্য, বর্ব্বরতা কেন না শিখিবে ?
গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দুর্ম্মতি।

সহসা লক্ষ্মণ জ্ঞান পাইয়া ধনুকে জ্যা আরোপণ করিলেন, মেঘনাদ শঙ্খ, ঘন্টা প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া লক্ষ্মণকে বিব্রত করিয়া তুলিলেন, লক্ষ্মণ অসির আঘাতে মেঘনাদকে ধরাশায়ী করিলেন

মেঘ। বীর কুলগ্লানি—
সুমিত্রা নন্দন তুই, শতধিক্ তোরে!
রাবণ নন্দন আমি, না ডরি শমনে।
কিন্তু, তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজ,
পামর, এ চির দুঃখ রহিলরে মনে!
দৈত্য কুলদম্ ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে ?
আর কি কহিব তোরে ? এ বারতা যবে
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে
নরাধম ? জলধির অতল সলিলে
ডুবিস যদিও তুই, পশিবে সেদেশে
রাজরোষ—বাড়বাগ্নি রাশি সমতেজে।

দাবাগ্নি সদৃশ তোরে দগ্ধিবে কাননে
সে রোষ, কাননে যদি পশিস্ কুমতি।
নারিবে রজনী, মূঢ়, আবরিতে তোরে।
দানব, মানব, দেব, কার সাধ্য হেন,
ত্রানিবে, সৌমিত্রি, তোরে রাবণ রুষিলে ?
কেবা এ কলঙ্ক তোর ভঞ্জিবে জগতে
কলঙ্কি ?

যবনিকা

বিদ্যা। ধন্য, শতধন্য মধুসূদন, এ কীর্ত্তি তব রহিবে অমর !
মধু। তব আশীর্ব্বাদ লইলাম শিরপাতি।

পঞ্চম দৃশ্য

খিদিরপুর জেমস্ লেন

রাজনারায়ণ দত্তের গৃহকক্ষ

প্যারীচরণ ও অমিয়

প্যারী। মধু এখনি আসবে। তাকে বুঝিয়ে সম্পত্তির ভার নিতে হবে। সাবধান ! তোমার চ্যাড়াং চ্যাড়াং কথা যেন না বল। কার্য্য পণ্ড কর্ব্বার যত কিছু বুদ্ধি তা তোমার মাথায় আছে।

অমিয়। তা বই কি ? বুদ্ধির ঢেকি আমার ! চিরটা কাল পরের ঘরে রেখে লাঞ্ছনা গঞ্জনা ভোগালে ত কম নয়। এখন বুদ্ধির জাহাজ বার হচ্ছে। তা, হোক। আমি বা নাই কথা কইলাম ! খেষ্টানের

সঙ্গে আবার কি কথা কইব? আবার মেমটা আসবে না কি? বিছানা পত্র সব ছুঁয়ে দেবে। এই অবেলায় কাচবে কে?

প্যারী। তোমার আর বিছানার মায়া করতে হবে না। সম্পত্তিটা একবার হাত করতে পারলে হয়! তার পর……যাক, সে পরের কথা পরে ভাবা যাবে!

মধুসূদনের প্রবেশ

মধু। লীলা আছিস নাকি?

প্যারী। এস, এস, ভাই এস! তোমার জন্ম আমি কাজ কর্ম্ম বন্ধ করে বসে আছি। কতদিন পরে তুমি আপন ঘরে আসবে, আমার কাকা আজ নেই। (কান্নার সুরে) কাকীমাও নেই। তোমায় আর চিনবে কে ভাই। ছোট কাকীমা তোমার কদর কি বুঝবেন!

মধু। তাইত দাদা! এই সেই ঘর, এই সেই মায়ের ছবি। কিন্তু, কেউ নাই আজ আমায় আহ্বান করতে! আমি আছি, আমার মা নাই। একদিন এই ঘরেই মাকে আমি ছেড়ে গেছি। আমায় ধরে বলেছিলেন—'মধু, বাবা! আমায় ছেড়ে যাসনি' তবু হাত ছিনিয়ে ছুটে বার হয়েছিলুম, সেই যে কান্নার সুর এখনো আমার কাণের ভিতরে বাজছে! আমি যেন—স্বপ্নের ঘোরে এখনো আমার স্নেহময়ী মায়ের কান্নার সুর শুন্‌তে পাই। প্রাণের যাতনায় স্বপ্ন টুটে যায়, হাত বাড়িয়ে অন্ধকারের মধ্যে মায়ের স্পর্শ পাবার জন্ম অস্থির হয়ে উঠে! কিন্তু, সে স্বপ্ন, প্রভাতের আলোর মাঝেই যেন মিলিয়ে যায়! ভাবি, আবার সে স্বপ্ন আমি কখন দেখ্‌ব! (ছবির সম্মুখে যাইয়া) মা! মা! আমার প্রণাম লও মা!

অমিয়। ওই বুঝি সব ছুঁয়ে দিলে!

প্যারী। চুপ্‌।

মধু। দাদা! ছোট মা কোথায়?

প্যারী। পাশের ঘরে আছেন, দেখা হবে এখন! বৌমা কোথায়?

মধু। ওই ঘরেই বোধ হয় গিয়েছে।

অমিয়। তবেই হয়েছে!

প্যারী। চুপ্।

মধু। বৌদিকে যেন কেমন কেমন দেখাচ্ছে।

অমিয়। না ভাই! মনটা বড় খারাপ কিনা তাই।

মধু। দাদা! আমি বিলাত যাব স্থির করেছি।

অমিয়। তা যাবে বৈকি?

প্যারী। সে তো তোমার বাল্যের স্বপ্ন মধু!

মধু। হাঁ, দাদা! ইয়োরোপ ভ্রমণ আমি কর্ব্ব। মহাকবিদের পীঠস্থান দেখে ধন্য হতে চাই। তাঁদের আশীর্ব্বাদ পেতে চাই।

প্যারী। তোমার কাব্য, তোমার কীর্ত্তি, যে বাংলা পরিপূর্ণ করেছে।

মধু। বাংলা ভাষাকে আমি সমৃদ্ধ কর্ব্ব, আমার জন্মভূমির নাম, আমি চিরস্মরণীয় কর্ব্ব দাদা!

প্যারী। তাই কর মধু!

মধু। আমি আমার সম্পত্তির ব্যবস্থা করে যেতে চাই। যার আয় হতে হেনরিয়েটাকে মাসিক দেড়শত টাকা দিতে হবে, আর আমার খরচ বাবদ বিলাতে পাঠাবে দুইশত টাকা।

প্যারী। সে ব্যবস্থা আমিই কর্ব্ব মধু! এ ত আমারই কর্ত্তব্য! মহাদেব চাটুজ্জেকে বলেছি, সে নিতে চেয়েছে।

মধু। আমি নিশ্চিন্ত হলাম। বিদ্যাসাগর বলেছিলেন, এমন কাজে কথায় এক বিশ্বাসী বাঙ্গালী পাওয়া বড়ই দুষ্কর।

প্যারী। ছিঃ ছিঃ তা কেন হবে। তুমি আমার ভাই। কাকার আদুরে ছেলে, যাবে বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়ে কৃতী হতে, মহাকবিদের জন্মস্থান

দেখে ধন্য হতে, আমার দেশকে গৌরব মণ্ডিত করতে, আর, আমি তোমায় কথা দিয়ে তার খেলাপ কর্ব্ব। এতদূর হীনতা কি তুমি আশা কর মধু? আমায় এতদিন দেখেছো তো? কাকার সঙ্গে আমার ব্যবহার দেখেছ! এখন তুমিই বিচার কর, আমি আর কি বল্‌ব। তুমিত বিদ্বান্, বুদ্ধিমান্! আমার আর কি? তোমার আর কাকীমার জন্যই ভাবনা।

মধু। তোমার ব্যবস্থাই আমি মেনে নেবো! দলিল লেখা পড়া করে, তোমার কথামত, মহাদেব আর তোমার উপরেই সম্পত্তির ব্যবস্থা ভার দেব! মাসে মাসে টাকাটা যেন ঠিক পাঠান হয়, কারণ, বিদেশ, সেথায় আর কি উপায় কর্ব্ব তখন বলুন!

প্যারী। বিলক্ষণ! তোমার কোন ভয় নেই। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে, সাগর পাড়ী দাও, আমার কর্ত্তব্য আমি কর্ব্বই।

মধু। হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা!

হেনরিয়েটার প্রবেশ

এই দেখ আমার মায়ের ছবি! আর এই ঘরে আমার বাবা থাকতেন। এ যে আমার পুণ্যতীর্থ হেনরিয়েটা!

অমিয়। ওই ঘরে চল! খাবার দেওয়া হয়েছে। কতদিন পরে এলে।

মধু। যাই বৌদি! আর একবার মাকে প্রণাম করে যাই।

হেন। আমিও প্রণাম করছি মা!

ষষ্ঠ দৃশ্য

দিগম্বর মিত্রের নাট-মন্দির

জন্মাষ্টমীর উৎসব বাসর

সময়—১৮৬২ খৃঃ

মধুসূদনের বয়স—৪১ বৎসর

মধুসূদন, বিদ্যাসাগর, গৌরদাস, বঙ্কিম, মনোমোহন প্রভৃতি

গৌর। মনোমোহনের পরিকল্পনা মত আজ মধুর ব্রজাঙ্গনা কাব্যের কয়েকটী গীত অভিনয় হবে। আপনারা শুনে আনন্দ লাভ করুন।

বঙ্কিম। খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ কর্লেও প্রাণটা তাঁর যে কত হিন্দুত্বে ভরপুর তাই জানবার সুযোগ পেয়েছি এই ব্রজাঙ্গনা কাব্যের মধ্যে!

বিদ্যা। আমার ত এই ব্রজাঙ্গনা কাব্যখানি সবচেয়ে ভাল লাগে! সহজে বুঝতে পারি! বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস, গোবিন্দদাসের পরে এমন মন মাতান গান আর শুনিনি।

মধু। সাগর যে আমাকে স্নেহ করেন তার পরিচয় হয় প্রত্যেকটী কথায়।

মনো। মধু তুমি বিলাত যাত্রা কর্ব্বে কবে?

মধু। সবই স্থির করে ফেলেছি, যাবার দিনটা এখনো স্থির করতে পারিনি।

বিদ্যা। বিদেশে গিয়ে বিপদে না পড়। বাঙ্গালীর কথার মূল্য যে কতটুকু তা আমি বিধবা বিয়ের ব্যাপারে জড়িয়ে হাড়ে হাড়ে অনুভব করেছি!

মধু। তখন ভরসা করুণাসাগর!

গৌর। এথন গীত অনুষ্ঠান আরম্ভ হচ্ছে।

রঙ্গমঞ্চের যবনিকা উত্তোলিত হইল। বৃন্দাবন, যমুনা পুলিন, কুঞ্জবনে শ্রীরাধা ও বিশাখা

শ্রীরাধা। (গীতি)

কি কহিলি কই, সই, শুনি লো আবার
মধুর বচন।

সহসা হইনু কালা, জুড়া এ প্রাণের জ্বালা,
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি,
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারমণ।
কহ, সখি, ফুটিবে কি এ মরুভূমিতে
কুসুম কানন?

বিরহ বিষের তাপে, শিখিনী আপনি কাঁপে
কুলবালা এ জ্বালায় ধরে কি জীবন?
হাদে তোর পায়ে ধরি, কহ না লো সত্য করি
আসিবে কি ব্রজে পুনঃ রাধিকারতন!
এই দেখ ফুল মালা, গাঁথিয়াছি আমি
চিকন গাঁথন!

দোলাইব শ্যামগলে, বাঁধিব বধুরে ছলে
প্রেম ফুল ডোরে তাঁরে করিব বন্ধন!
মধু যার মধু-ধ্বনি, কহে কেন কাঁদ ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন!

বিশাখা। (গীতি)—

যে কালে ফুটে লো ফুল কোকিল কুহরে, সই
কুসুম কাননে;
মুঞ্জরয়ে তরুবলী, গুঞ্জরয়ে সুখে অলি,
প্রেমানন্দ মনে,
সেকালে কি বিনোদিয়া, প্রেমে জলাঞ্জলি দিয়া,
ভুলিতে পারেন, সখি, গোকুল ভবন?
চল লো নিকুঞ্জবনে পাইব সে ধন।

স্বন্‌-স্বন্‌-স্বনে, শুন, বহিছে পবন সই
গহন কাননে,
হেরি শ্যামে পাদ প্রীত, গাইছে মঙ্গল গীত
বিহঙ্গম সনে।
কুবলয়-পরিমল,
নহে এ; স্বজনি, চল—
এ সুগন্ধ দেহ গন্ধ বহিছে পবন।
হায় লো, শ্যামের বপু সৌরভ সদন!

শ্রীরাধা। নাচিছে কদম্ব মূলে বাজায়ে মুরলীরে,
রাধিকা-রমণ;
চল, সখি, ত্বরা করি, দেখিগে প্রাণের হরি,
ব্রজের রতন।
চাতকী আমি, স্বজনি, শুনি জলধর ধ্বনি
কেমনে ধৈরয ধরি থাকিলো এখন?
যাক মান, যাক কুল, মনতরী পাবে কূল,
চল, ভাসি প্রেমনীরে, ভেবে ও চরণ!

মানস সরসে সখি, ভাসিছে মরালরে,
কমল কাননে!
কমলিনী কোন ছলে, থাকিবে ডুবিয়া জলে
বঞ্চিয়া রমণে,?
যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে
মদন রাজার বিধি লঙ্ঘিব কেমনে ?
ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মনরে,
মুরারির বাঁশী।
সুমন্দ মলয় আনে, ও নিনাদ মোর কানে
আমি শ্যাম দাসী।
ফুটিছে কুসুমদল, মঞ্জু কুঞ্জ বনেরে,
যথা শুণ মণি।
হেরি মোর শ্যাম চাঁদ পীরিতের ফুল ফাঁদ,
পাতেলো ধরণী!

বিশাখা। সখিরে!
পাদ্যরূপে অশ্রু ধারা দিয়া ধোব চরণে,
দুই কর কোকনদে, পূজিব রাজীব পদে,
শ্বাসে ধূপ, লো প্রমদে ভাবি না মনে।
কাঞ্চন কিঙ্কিনী ধ্বনি বাজিবে লো সঘনে
সখীরে!
এ যৌবন ধন, দিব উপহার রমণে।
ভালে যে সিন্দুর বিন্দু, হইবে চন্দন বিন্দু
দেখিব লো দশ ইন্দু সুনখ গগনে।
চিরপ্রেম বর মাগি লব, ওলো ললনে।

শ্রীরাধা। চল সখি, ত্বরা করি, দেখিলো প্রাণের হরি,
গোকুল রতন।
নাচিছে কদম্ব মূলে বাজায়ে মুরলীরে
রাধিকা রমণ!

যবনিকা

বিন্তা। প্রেমাস্পদের প্রাণে আপনাকে সম্পূর্ণরূপে বিলিয়ে দিবার এই যে আদর্শ, এটা সত্যই পরিস্ফুট করে তুলছে মধু! তোমাকে আমি আমার এই প্রীতি ফুলহার উপহার দিচ্ছি।

(মধুসূদনকে মাল্যদান)

মধু। আপনাদের শুভ ইচ্ছা, আমার জয়যাত্রার পাথেয় হয়ে রইবে সাগর!

সপ্তম দৃশ্য

কলিকাতা। ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড

মধুসূদনের বৈঠকখানা ঘর

মধুসূদন ও গৌর

গৌর। তোমার এই ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়ীটা বাংলার পীঠস্থান হয়ে রইবে মাইকেল! তোমার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ অবদান —মেঘনাদ বধ কাব্য, তিলোত্তমা কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, শর্ম্মিষ্ঠা, কৃষ্ণকুমারী নাটক এই বাড়ীতে বসেই রচনা করেছ।

মধু। ব্রজাঙ্গনা কাব্য আমার রচনার মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে আমি মনে করি।

গৌর। পিতার নিকট কন্তাই আদরের হয়ে থাকে মধু!

মধু। তা তুমি বলতে পার। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরকে বলেছিলাম, আমি অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্ত্তন কর্ব্ব বঙ্গ ভাষায়। তিনি অট্টহাস্য করে বলেছিলেন, "মধু তুমি খেপেছে!" আমি বল্লুম,—কেন হবেনা, সংস্কৃত ভাষার দুহিতা যে বাংলা ভাষা, মায়ের শক্তি তার মধ্যে লুকিয়ে আছে। সুযোগ পেলেই অঙ্কুরিত হয়ে নব নব পুষ্প মুকুলে মুঞ্জরিত হয়ে উঠবে! এই দেখনা, তাই তিলোত্তমা কাব্যখানা প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচনা করে ঠাকুরকেই উপহার দিয়েছি।

গৌর। ঠাকুর এই রচনার লালিত্য ও গাম্ভীর্য্য দেখে সত্যই পুলকিত হয়েছেন। তোমার সুখ্যাতি শতমুখে করছেন।

মধু। মেঘনাদ বধ কাব্যটীর মুদ্রণ ব্যয় দিয়েছেন রাজা দিগম্বর মিত্র, তাঁকেই আমার এই অমূল্য সম্পদ উৎসর্গ করে কৃতার্থ হয়েছি।

গৌর। তোমার আদরের মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠা কোথায়? ছেলে মিলটন-কেও তো দেখছিনা।

মধু। তারা বেড়াতে গিয়েছে হেনরিয়েটার সঙ্গে ইডেন গার্ডেনে।

গৌর। চল আমরাও একটু ইডেন গার্ডেনে বেড়িয়ে আসি।

মধু। বেশ চল! আমি এইটুকু লিখে নিই।

জনৈক বৈষ্ণবের প্রবেশ—তাঁহার দেহে ও ললাটে বৈষ্ণবসুলভ গোপীচন্দনের তিলক ও হরিনাম চিত্রিত

বৈষ্ণব। (ঘরে সাহেব দেখিয়া ইতস্ততঃ করিয়া ফিরিবার উপক্রম) বাড়ী ভুল কর্লুম নাকি?

মধু। (মুখ তুলিয়া) আপনার কি প্রয়োজন?

বৈষ্ণব। আজ্ঞে, ভুলবশতঃ ঘরে ঢুকেছি, মাপ কর্ব্বেন! জয় রাধে!

(উভয় হস্ত জোড় করিয়া কপালে ঠেকাইলেন)

মধু। কোন্ ঠিকানা চান আপনি?

বৈষ্ণব। আজ্ঞে! জয় রাধে! (হস্ত তুলিয়া উদ্দেশে প্রণাম) এই

পরম বৈষ্ণব শ্রীমধুসূদনের নাম শুনে এসেছিলাম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হেতু! শুনলুম, তিনি এইস্থানে ৬নং বাড়ীতে আছেন! ভুল কর্লুম নাকি! উপরের আর কোন ঘর হতে পারে!

গৌর। আপনার প্রয়োজন শুনতে পারি কি? (ঈষৎ হাসিয়া) এইটিই ৬নং এবং এই ঘরেই তিনি আছেন! ভুল করেননি! বসুন এই চেয়ারে। কোথা থেকে আসছেন?

বৈষ্ণব। আজ্ঞে! জয় রাধে! (উদ্দেশে প্রণাম) শ্রীধাম নবদ্বীপ হতে আস্‌ছি। বৈষ্ণবকুলতিলক শ্রীমধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্য পাঠ করে আমি পরম প্রীতি লাভ করেছি! বর্ত্তমান যুগে—এই খৃষ্টানী সভ্যতার মধ্যেও যে এমন একখানি অপূর্ব্ব ভক্তিরসাশ্রিত কাব্য যাঁর প্রাণ হতে প্রকাশিত হয়েছে, তিনি যে আমার নমস্য, তাঁর পদরেণুস্পর্শে পবিত্র হতে এসেছি আমি!

মধু। যদি তাঁকে দেখে আপনার ভক্তি বিনষ্ট হয়ে যায়?

বৈষ্ণব। জয় রাধে! (প্রণাম) তা হতে পারেনা মশাই! আঃ হাঃ কি ভাব। কি ভাষা! কি রসধারা! আমি আমার চোখের উপর যেন ব্রজধাম প্রত্যক্ষ করছি। শ্রীরাধা (প্রণাম) যেন কেঁদে কেঁদে ব্রজমণ্ডল মধ্যে প্রত্যেকটী ময়ূরী, বকুল, জলধর, উষা, কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখে শ্যামসুন্দরের স্মৃতির বিরহ ব্যথায় কাতরা হয়ে ছুটে চলেছেন! এমন কবি আমার কলকাতায় রয়েছেন—তাঁকে আমি দেখব না! জয় রাধে! (প্রণাম)

কি সুন্দর গীত!—

ওই শুন, পুনঃ বাজে মজাইয়া মনরে;
মুরারীর বাঁশী!
সুমন্দ মলয় আনে, ওনিনাদ মোর কানে
আমি শ্যামদাসী!

আঃ হাঃ কি ভাব! মনপ্রাণ আমার মুগ্ধ হয়ে গেল! জয় রাধে! (প্রণাম)

গৌর। (হাসিয়া) কবি মধুসূদন যে আপনারই সম্মুখে বসে আছেন বৈষ্ণব মশাই!

বৈষ্ণব। জয় রাধে! (প্রণাম) য়্যাঃ! (সবিস্ময়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া) এই সাহেব!

মধু। হাঁ সাধক মশাই। আমিই সেই দীন কবি মধুসূদন! আমার প্রণাম গ্রহণ করুন।

বৈষ্ণব। আমায় কি মসকারা কর্চ্ছেন মশাই! জয় রাধে! (প্রণাম) এই সাহেব লিখবেন বৈষ্ণব কবিতা!

মধু। (বই বাহির করিয়া) এই নিন্ আমার ক্ষুদ্র উপহার! কবির পোষাকটাই দেখলেন, তার প্রাণটা দেখবার চেষ্টা কর্লেন না।

বৈষ্ণব। তাইত! স্বপ্ন নয়! সত্য! আপনি মশাই শাপভ্রষ্ট মহাপুরুষ! আমার প্রণাম নিন। জয় রাধে! (প্রণাম)

মধু। অপরাধী কর্ব্বেননা বৈষ্ণব চূড়ামণি! আমি আপনার দাসানুদাস! আমার বাড়ীতে থেকে যেতে হবে আপনার। স্বপাকের ব্যবস্থা করে দেবো! এই নিন প্রণামী—(কুড়িটাকার নোট প্রদান)

বৈষ্ণব। জয় রাধে! (প্রণাম) আমায় আলিঙ্গন দিন মহাকবি মধুসূদন। আমি আনন্দে আত্মহারা হলুম! জয় রাধে! (প্রণাম)

অষ্টম দৃশ্য

সাগরদাঁড়ী

কপোতাক্ষী তীর

পণ্ডিতমশাই, হেনরিয়েটা, আলবার্ট ও মধু

মধু। বহুদিন পরে জন্মভূমিতে এসে আমার মন হর্ষ বিষাদে উদ্বেলিত হয়ে উঠেছে পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত। এই সেই বটগাছ, এরই স্নেহছায়ে বসে বৈকালে তুমি রামায়ণ, মহাভারত পড়তে। তোমার কণ্ঠস্বর ছিল সুমধুর, তাই গ্রামের প্রাচীনারা তোমাকে দিয়েই পড়াতে পছন্দ করতেন।

মধু। সত্য পণ্ডিতমশাই! সে কি সুখের দিনই গিয়েছে! এই ছায়া-শীতল বটমূল, আর এই কপোতাক্ষী নদীর শীতল জল। এর উপর আমার মনের কি টানই ছিল! যেন একটা স্বপ্নলোকের সুধাভরা আনন্দ আলয় আমার জীবন নাটকের প্রথম অঙ্ক হতে ধীরে ধীরে অপসারিত হচ্ছে, সম্মুখে এগিয়ে আসছে প্রলয়ের প্লাবন, ঝঞ্ঝাবাতের গভীর গর্জ্জন, আর নটরাজের তাণ্ডব নর্ত্তন! সে দুঃসহ জীবনের কর্ণধার হবে এই জীবনসঙ্গিনী হেনরিয়েটা, আর বেদনার বিষ পান করবে এই সরল শিশু আলবার্ট আর মিলটন!

হেন। কেন বৃথা বিষাদের ভার স্মৃতিতে আনছ মাই ডার্লিং! ওই দেখ কেমন সুন্দর নৌকাগুলি চলছে, তার মাঝির গান ভেসে আসছে—মৃদুমন্দ মলয় পবন হিল্লোলে। এই নদী, এই গীতি, আর এই যে ভাষা বিহীন প্রকৃতির আনন্দ আহ্বান এতে যে আমি মুগ্ধ হয়েছি কবি! তোমারি শৈশবের লীলা নিকেতন, সত্যই সুন্দরের উপাসক গড়ে তুলতে পারে!

মধু। এইত সেই বাদাম গাছটী, আর ঐ সেই চণ্ডীমণ্ডপ! যেখানে আমি প্রথমপাঠ গ্রহণ করেছিলাম আপনার নিকট! হেন্‌রিয়েটা! এই পণ্ডিতমশাই আমায় পুত্রসম স্নেহ করেন!

হেন। আমার প্রণাম গ্রহণ করুন পণ্ডিতমশাই!

অমিয় ও প্যারীচরণের প্রবেশ

অমিয়। এই যে আমার মা লক্ষ্মী এসেছেন ঘরে।

মধু। বৌদি! বৌকে বরণ কলেনা?

অমিয়। ও লীলা! শিগ্‌গির আমার সিন্দুর কৌটাটা নিয়ে আয় মা! এস, এস, বাছারা এস! বড় কষ্ট হয়েছে নিশ্চয় এত পথ আসতে!

মধু। না বৌদি! এতটুকুও কষ্ট হয়নি! নূতন নদী, নূতন গ্রাম দেখতে দেখতে হেনরিয়েটা আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছে যে!

লীলার সিন্দুর কৌটাসহ প্রবেশ

লীলাও এসেছিস্, আয় মা!

লীলা। আমার প্রণাম নিন্ কাকা!

মধু। সুখী হও বাছা!

অমিয়। (সিন্দুর পরাইয়া) এই দেখ কেমন মানিয়েছে।

প্যারী। মানাবে না, তোমার মত কালো পেত্নী তো নয়।

অমিয়। আমি পেত্নী! তা একটা সুন্দরী অপ্সরী দেখে আনলেই তো পারতে!

মধু। আঃ থাম বৌদি! আয় লীলা আমার কাছে!

অমিয়। আমার অত খোঁটা সয়না ভাই! আমি ত সেধে ঘরে আসিনি! এই যেমন তুমি! কি না কাণ্ড করলে বিয়ের জন্য!

মধু। গঙ্গাজল কোথায় পাবে বৌদি! তোমার যে জাত গেল!

অমিয়। এই গাঙেই স্নান কর্ব্ব, আর কি কর্ব্ব বল!

মধু। তাই করো! (দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া) খেতে দেবেতো দুটো!

প্যারী। ও সব কি কথা ভাই! তোমারই যে বাড়ী! তোমারই সম্পত্তি। আমরা আর কে?

(পাঠশালার ছাত্রগণ গান করিতে করিতে প্রবেশ করিল ও গীত শেষে মধুসূদনের কণ্ঠে বকুলমালা পরাইয়া দিল)

গীতি

নমো নমো নমো নমো
মহাকবি মধু নমো।
জগতের ভাব ভাষা আহরণ
জীবন সাধনা ব্রত আজীবন,
সেই ফুলে তুমি, বাণী পদতলে
পূজা দিলে অনুপম।
জ্বলে জ্যোতিঃ শিখা অন্তরে তব,
প্রতিভায় জাগে দ্যুতি অভিনব,
আরতি করিলে ভারতী প্রতিমা
সেই দীপে মনোরম।
আপনার দেশে বেসেছ যে ভাল,
প্রাণের আগুনে তাই তুমি জ্বাল,
দেশ অনুরাগ মঙ্গল আলো,
প্রভাত তপন সম।

রতনের খনি মহাকাব্য দানি,
বাংলার নব মনীষার বাণী
ধরণীরে তুমি দিলে প্রাণ ভরি,
ভাষা ভাবে নিরুপম।

আল। ড্যাডী, আমি এই গানটা শিখব, আমার বড্ড ভাল লেগেছে। ম্যামী! আমার খুব স্ফূর্ত্তি হচ্ছে, এমন সুন্দর হাওয়া, এমন নদী, এমন ছেলেরা, আমি কলকাতা আর যাবনা ড্যাডী।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

মধুসূদনের গৃহকক্ষ

স্থান—ভরসেলস্ নগর (ফ্রান্স)

সময়—১৮৬৪ খৃঃ

মধুসূদন ও হেনরিয়েটা

মধু। আমি এখন ঘরের বার হতে পারছি না, কি জানি কখন আমায় য়্যারেষ্ট করে!

হেন। তোমার আজ বার হতে হবে না। আমিই বাইরের ঘরে থাকবো, যা হয় আমি করব!

মধু। তুমি আর কি করবে হেনরিয়েটা! বদান্য ফরাসীদের অনুগ্রহেই যে এত দিন ছেলে মেয়ে নিয়ে কোন প্রকারে বেঁচে আছি। তাঁরাই বা আর কতদিন চালাবেন। তাঁরা লুকিয়ে, লুকিয়ে খাবার রেখে যান ঘরে, তাও দেখেছি!

হেন। কিন্তু, রুটিওয়ালা, দুধওয়ালা, পোষাকের দোকানওয়ালা বিল এনেছিল। তাদের বলে আমি দুটি দিনের সময় নিয়েছি।

মধু। দু'দিন আর ক'দিন। ওতো দেখতে দেখতেই কেটে যাবে।

হেন। আমি আর কি করতে পারি!

মধু। তাইত! তুমি আর কি কর্ব্বে!

(বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ)

এখন আমি কি বলব হেনরিয়েটা! হয়ত সেই লোকটী বাড়ী ভাড়ার জন্য এসেছে। দু'মাসের ভাড়া দিতে পারিনি! কতদিন আর স্তোকবাক্য দিয়ে রাখব!

হেন। তুমি বরং ঘরের মধ্যে যাও, আমিই বলছি!

মধু। সে কেমন হবে!

হেন। যাই হোক। পরে তোমায় বুঝিয়ে দেবো! লক্ষ্মীটি যাও বলছি!

মধু। আচ্ছা, যাই! এমন করে চোরের মত লুকিয়ে আর ক'দিন চলবে তাই ভাবছি!

অসহায় ভাবে প্রস্থান

হেনরিয়েটা দরজা খুলিতেই মনোমোহন প্রবেশ করিলেন, তাঁহাকে দেখিয়া হেনরিয়েটা আনন্দে আত্মহারা হইলেন' চীৎকার করিয়া ডাকিলেন

হেন। ও মাই ডিয়ার পোয়েট! শীঘ্র এস, দেখ কে এসেছেন।

মধু। (উন্মনা ভাবে প্রবেশ) কে এসেছেন! ও ভাই মনোমোহন! তুমি কোথা থেকে এসে হাজির হলে, আমি তোমায় পেয়ে প্রাণ ফিরে পেলাম। আনন্দে আমার চীৎকার করতে ইচ্ছা হচ্ছে। বস ভাই, বস! খবর কি?

হেনরিয়েটার প্রস্থান

মনো। বন্ধের দিনে, লণ্ডন থেকে তোমার সংবাদ নিতে এলাম ভাই। তুমি সহসা চলে এলে!

মধু। না এসে করি কি ভাই। দেনার দায়ে অস্থির হয়ে পালাতে হল! দেশে মহাদেব ও আমার এক জ্ঞাতি ভাইকে সম্পত্তি লীজ দিয়েছিলাম! তারা আমার টাকা ও হেনরিয়েটার মাসিক টাকা

বন্ধ করে দিল। মাত্র দুটি মাস দিয়েছিল। এমন করবে ভাবতে পারিনি। হেনরিয়েটা অনুপায় হয়ে ইংলণ্ডে এসে উপস্থিত হল। আমি ত জগৎ অন্ধকার দেখলাম। ব্যারিষ্টারী পড়া শেষ হয়নি। কিন্তু করি কি, পালিয়ে এলাম এই দেশে। প্যারীতে কিছুদিন ছিলাম, কয়েক মাস হল এখানে এসেছি! ভরসেলস্‌এর অবস্থা আমার আরও সঙ্গীন্! আজ দেনার দায়ে লুকিয়ে আছি, ঘর হতে বার হতে ভয় হচ্ছে। ফ্রেঞ্চ জেল ভাগ্যে আছে ভাই।

মনো। তাই ত! এত দেনা হল কেন?

মধু। বল্লুম তো! আর আমায় ত তুমি চেন। হাতে টাকা থাকলে খরচ যে কোন পথে হয়ে যায় তার খোঁজ আমি পাই না।

মনো। তুমি চল দেখি ইংলণ্ড, একটা ব্যবস্থা কর্ব্ব আমি! ব্যারিষ্টারী পাশ করেই দেশে যাব!

মধু। তাই যেতে হবে। এদিককার অবস্থাটা যে অতীব জটিল। বিদ্যাসাগরকে পত্র দিয়েছি। তাঁর উত্তর এখনো পাইনি!

মনো। অন্য খবর কি। নূতন কিছু লিখলে মধু?

মধু। এখানে এসে ইটালী ভাষাটা শিখেছি। ইটালীর কবি পেত্রার্কার কাব্য পড়ে তাঁর অনুকরণে চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনা করে দেশে পাঠিয়েছি। ইটালীর ফ্লোরেন্স নগরে কবিগুরু দান্তের মৃত্যু ত্রিশত বাৎসরিক মহোৎসবে আমি কবিতা রচনা করে ইটালী-রাজ-সমীপে পাঠিয়েছিলুম। রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল আমার কবিতা পাঠ করে প্রীত হয়েছেন। এই দেখ তাঁর পত্র:

"It will be a ring which will connect the orient with the occident,—আপনার কবিতা গ্রন্থির ন্যায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে সংযুক্ত কর্বে।"

আমার চতুর্দ্দশ পদী কবিতা—কবিগুরু দান্তের প্রতি শোন!

নিশান্তে সুবর্ণ-কান্ত নক্ষত্র যেমতি
(তপনের অনুচর) সুচারু কিরণে
খেদায় তিমির-পুঞ্জে, হে কবি, তেমতি
প্রভা তব বিনাশিল মানস-ভুবনে—

(দরজায় কড়া নাড়িল)

মধু। এই হয়েছে ভাই! হয়ত আমার কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়েছে। এখন আমি কি করি বলত?

অন্য ঘরের মধ্যে প্রবেশ

মনোমোহন দরজা খুলিতেই—পিওন প্রবেশ করিল, তাহার হাতে একখানি ইন্‌সিওর খাম

পিওন। ইন্‌সিওর আছে—দেড় হাজার টাকার মিঃ দত্তের নামে।

মনো। ও ভাই মধু! শীঘ্র এস টাকা এসেছে! (পত্র পড়িয়া) বিদ্যাসাগর পাঠিয়েছেন।

মধুর প্রবেশ

মধু। কে? কে? বিদ্যাসাগর। করুণার সাগর আমায় এ যাত্রা বাঁচালে ভাই! (পত্র গ্রহণ)
হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা! আর ভয় নেই। এদিকে এস না মাই ডার্লিং!

হেনরিয়েটার প্রবেশ

এই দেখ দেড় হাজার টাকার নোট! এখন আনন্দ কর। খাবার আনাও, ছেলেটির জামা কিনে দাও, তোমার জুতা কেন?

হেন। বাস! ব্যবস্থা হয়ে গেল! এই আপনার স্বপ্নচারী কবি, মিঃ ঘোষ! একে নিয়ে আমি কি করে চালাই বলুন! এদিকে যে বাড়ী ভাড়া, দোকান দেনা, খাবার কেনা একান্ত আবশ্যক, তা কি ভেবেছেন মিঃ পোয়েট!

মধু। এই যাঃ! সব ঘুলিয়ে দিলে হেনরিয়েটা! আমার সাধের স্বপ্ন মেঘলোকে লুকিয়ে গেল! চল মনোমোহন লণ্ডনে ফিরে যাই। ব্যারিষ্টারীর সাফল্য নিয়ে দেশে ফিরতে হবে। এ দেশে আমার আর মন টিকছে না!

মনো। আমি যখন এসেছি তোমাকে নিয়েই দেশে ফিরব কবি!

মধু। এখন চল চা, খাবার, আর, দু' এক গ্লাস ব্রাণ্ডী খেয়ে স্ফূর্ত্তি করা যাক। মেঘ যে কেটে গেছে ভাই!

দ্বিতীয় দৃশ্য

কলিকাতা। গৌর দাসের বৈঠকখানা

গৌর ও ভূদেব

গৌর। মধু দেশে ফিরেছে, শুনেছ ভূদেব!

ভূদেব। কৈ না? কবে ফিরল?

গৌর। এইত মাত্র সাতদিন হ'ল। বিদ্যাসাগর জাহাজ ঘাটায় গিয়েছিলেন তাকে এগিয়ে আনতে।

ভূদেব। আমায় এতদিন বলনি কেন?

গৌর। শোন মজার গল্প! মধু জাহাজ হতে নেমেই দেখলে বিদ্যাসাগরকে! আর তাঁকে জড়িয়ে ধরে একটার পর একটা চুমু খেতে লাগল, নিরীহ বামুন ত মহা বিব্রত, সবাই দেখে অবাক!

ভূদেব। তারপর ?

গৌর। তারপর, এখন মধু ব্যারিষ্টার! রীতিমত সাহেব। সাহেব পাড়ায় ফ্লাট ভাড়া নিয়েছে! হেনরিয়েটা, ছেলে মিলটন, আলবার্ট, মেয়ে শর্ম্মিষ্ঠা সাথে আছে। গেল কাল আমি সাক্ষাৎ করে এলুম। আমায় পেয়ে কি আনন্দ। রীতিমত নাচতে সুরু কর্ল! মদটা একটু বেশী চালাচ্ছে বারণ কর্লুম। শোনে কে ? বিলেত ফিরে দেখছি ঐ বিগ্যাটা বেড়েই গিয়েছে!

ভূদেব। আমাদের সমাজ ম্লেচ্ছ দেশে যেতে নিষেধ করে যে ঐ জন্ম ভাই!

মধুসূদনের প্রবেশ

মধু। কি নিষেধ কর্চ্ছ ভাই ভূদেব!

(মধু ভূদেবের করমর্দ্দন করিতে উদ্যত হইল, ভূদেব তৎপরিবর্ত্তে নমস্কার করিলেন)

অলরাইট! নমস্কারই সই! আমি ভাই দেশ ছাড়া কতদিন তাত জান—নমস্কার! নমস্কার!

গৌর। এখন কি কর্ব্বে স্থির করেছ মধু!

মধু। ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেছি!

গৌর। তা নয়! তোমার সম্পত্তি ফিরে পাবার কি কর্চ্ছ ?

মধু। আমার মায়ের গহনাগুলা, আর দলিল দুই সরিয়েছেন দাদা! এর প্রতিশোধ না নিয়ে আমি ছাড়ব না ভাই।

ভূদেব। তুমি আর প্রতিশোধ নিয়েছ! তুমি কি কারো ওপর রাগ করতে জান ভাই।

মধু। ঠিকই বলেছ ভাই ভূদেব! আমার মনে রাগ নাই। শুধু

ভালবাসা আর প্রেম! কবির কাজ সৃষ্টি করা, ধ্বংস নয়। ক্রোধ ধ্বংস কর্ত্তেই পারে, সৃষ্টি করতে পারে না!

গৌর। কিন্তু, পরমহংস হলে সংসার চলে না।

মধু। পরমহংস নই, কিন্তু, পাপিষ্ঠও নই।

ভূদেব। কবি সুন্দরের উপাসক! সুন্দর মানুষের মনের আনন্দ হতে সৃজিত!

মধু। তুমি যাই বল ভাই। আমার এই জ্ঞাতি দাদাটি আমাকে আর হেনরিয়েটাকে যে দুর্দ্দশায় ফেলেছিলেন, সে দুঃখ আমার জীবনেও ভুল হবেনা। বিদ্যাসাগরের করুণায় ফ্রেঞ্চ জেল হতে নিস্তার পেয়েছি। এই বিদ্যাসাগর মানুষ নয় ভাই—দেবতা! নইলে আমার মত মানুষের জন্যও তাঁর প্রাণ কাঁদে!

ভূদেব। ওর মন সবার জন্যই কাঁদে ভাই! ও বাংলার করুণাসিন্ধু!

মধু। তবে শোন! চতুর্দ্দশপদী কবিতা—

বিদ্যার সাগর তুমি, বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু। উজ্জ্বল জগতে
হিমাদ্রির হেম কান্তি অম্লান কিরণে।
কিন্তু, ভাগ্য বলে পেয়ে যে মহা পর্ব্বতে,
যে জন আশ্রয় লয় সুবর্ণ চরণে,
সেই জানে কতগুণ ধরে কত মতে।

ভূদেব। চমৎকার!

গৌর। সাগরকে যে তুমি আবার হিমাদ্রি করলে। তোমার উপমা সত্যই সুন্দর! পাইকপাড়ার রাজা বলছিলেন—তুমি ভাই আরো ভাল করে নাটক লেখ! বিশেষতঃ হাস্যরসাত্মক নাটক বাংলায় বেশী নেই!

মধু। সময় পাচ্ছি না। ব্যারিষ্টারী আরম্ভ করেছি। ব্রীফ পাচ্ছি বেশ! তবু, খরচ সামলাতে পাচ্ছি না! ৬নং লাউডন ষ্ট্রীটের বাড়ীটা মাসিক চারশ টাকায় ভাড়া নিলুম। একখানা গাড়ীও কিনেছি।

ভূদেব। হাতটা একটু খাট করো। তোমার যে দরাজ খরুচে হাত! এখন ছেলে, মেয়ে ও মেম সাহেবের ভাবনাটা একটু ভেবো!

মধু। সংসারের ভাবনা আমি ভাবিনা ভাই। যেটুকু ভাবি কাব্যের বিষয় নিয়েই ভাবি! এখন দাদার কাছ থেকে গহনাগুলা আর মহাদেবের কাছ থেকে দলিলটা উদ্ধার করতে পুলিশের সাহায্য নেবো ভাবছি।

গৌর। সম্পত্তিটা উদ্ধার করতে পার্লে তা'থেকে আয়ও হবে যথেষ্ট! এ চেষ্টা তুমি ছেড়ো না মধু! এখন চল, বাবা তোমাদের জন্য ভেতরে অপেক্ষা কর্চ্ছেন!

তৃতীয় দৃশ্য

খিদিরপুর

প্যারীচরণের গৃহকক্ষ

লীলা ও হিমাংশু

হিম। আমার লক্ষ্মীটী একটা গান গাওনা, তোমার গানের সুর যেন আমার মনে শ্যামের বাঁশীর মতই বাজে!

লীলা। শ্যামের বাঁশী ছিল। কিন্তু, রাধার বাঁশীর কথা তো শুনিনি!

হিম। আমার রাধার বাঁশী এই মুখেই। (লীলার মুখেই টোকা মারিল)

। যাও !

হিম। যাব ! তবে চল্লুম।

লীলা। আমিও এই ধর্লুম !

হিম। আমি তবে ধর্লুম।

(লীলাকে জড়াইয়া ধরিয়া)

আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী
একবার বাজত, বাজত ?

লীলা। ছাড় ! এখনি মা এসে পড়বেন।

হিম। তাই কি হয় রাধে।

লীলা। আমি গাইছি। তুমি চুপ করে একটু এইখানটায় বস না লক্ষীটি !

হিম। বেশ ! তাই রাজি ! এই আমি বসলুম !

চেয়ারে বসিলেন, চা লইয়া চাকর দীননাথ প্রবেশ করিল

দীনু ! গান করতে পারিস্ ?

দীন। আজ্ঞে, আমার আর মান কি ?

লীলা। ও কানে কম শোনে !

হিম। ওঃ হ্যাঁ, তোর মান আছে বৈকি ?

দীন। আজ্ঞে আমার মীনু মরে গেছে অনেকদিন, তার জন্য এখনো আমি কাঁদি !

হিম। কর্ত্তা কোথায় রে দীনু ?

দীন। আজ্ঞে গর্ত্ত ! এখানেও গর্ত্ত আছে নাকি ? সেদিন পথে গর্ত্তে পড়ে এই দেখুন না কি ব্যথাটাই পেয়েছি !

হিম। ভাল কালার পাল্লায় পড়লুম! তোর মাঠাকরুণ কোন ঘরে দীননাথ?

দীন। জগন্নাথ! হাঁ, জামাইবাবু! আমি জগন্নাথ দেখতে যাব তোমার সাথে! কতদিনের সাধ!

হিম। নাঃ, আর পারিনে! লীলা তুমি গান ধর।

দীন। ধর বাড়ী ত এই কাছেই জামাইবাবু! যাবেন, চলুন নিয়ে যাই। কি অসুখ হল?

হিম। তোর মুণ্ডু হল!

দীন। আজ্ঞে, মোণ্ডা অনেক দিন খাইনি, যদি খাওয়াতেন একদিন!

হিম। এই নাও! তোমার মুণ্ডু খাওগে! আমিও নিস্তার পাই!

দীন। বেঁচে থাকুন জামাইবাবু! আমার লীলা মা পাকা চুলে সিঁদুর পরুন!

প্রস্থান

হিম। এই লোক নিয়ে কি কাজ চলে তোমাদের?

লীলা। বাবা বলেন, ঐ রকম লোকই ভাল, ঘরের কথা পরের বাড়ী বলতে পারে না।

হিম। শুনে বাধিত হলুম! এখন গানটা শোনাও।

লীলা। শোন—

গীত

ধরণী সেজেছে সুন্দরী!
প্রাণ মন মম, প্রেমে অনুপম
হৃদয় উঠেছে গুঞ্জরী।
এসেছে আনন্দ, ছুটিছে সুগন্ধ
আশার মুকুল মুঞ্জরী।

জীবন কানন, আজি সুশোভন
নাচিছে পরাণ কুঞ্জরী।
এস হে রতন, মানসমোহন,
চাহিছে এ চিত সুন্দরী!

(বাহিরে কোলাহল)

লীলা। বাইরে কিসের কোলাহল শুনতে পাচ্ছি! চল দেখে আসি।
হিম। চল!

লীলা ও হিমাংশুর প্রস্থান

প্যারীচরণ ও অমিয়ের প্রবেশ

প্যারী। সর্ব্বনাশ হল! মধু পুলিশ নিয়ে এসেছে আমাকে য়্যারেষ্ট করতে। তার মায়ের গহনা, আর দলিল চায়। ফৌজদারী করেছে।
অমিয়। ওরে বাবারে পুলিশ! আমি কোথায় যাবরে! (ক্রন্দন)
প্যারী। থাম! আর চীৎকার করে বিপদ বাড়িও না!
অমিয়। তবে কী কর্ব্ব? লীলা? ও লীলা? কোথায় গেলিরে। গাময় গহনা রয়েছে। এখন কি কর্ব্ব বল!
প্যারী। তাইত!

মধুসূদনের প্রবেশ

মধু। বিশ্বাসঘাতক! পাষণ্ড! আমি তোমায় জেল খাটিয়ে ছাড়ব। আমাকে তুমি পথে বসিয়েছ!
অমিয়। ওরে কি সর্ব্বনাশ হলরে! (ক্রন্দন)
প্যারী। আমি! কৈ না তো!
মধু। হাঁ, তুমি! আমার সরল বিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে মাদ্রাজে

থাকবার সময় একবার জাল উইল করেছ আমাকে ফাঁকি দেবার জন্য। আর এবার বিলাত পাঠিয়ে যা করেছ তার শোধ আমি তুলব। এখন বার কর আমার মায়ের গহনা, আর মহাদেবের সেই দলিল!

প্যারী। আমার কাছে তো দলিল নেই ভাই! সেতো মহাদেব!

মধু। মহাদেব তোমারি চেলা। আমার সঙ্গে তোমার আর কোন সম্বন্ধ নেই। আমি তোমায় জেলে পাঠিয়ে তবে ছাড়ব!

অমিয়। মধুসূদন! ভাই আমার!

মধু। থাক! আর মায়াকান্না কাঁদতে হবে না! ঢের হয়েছে! এখনি পুলিশ আসছে। ঠাণ্ডাগারদে গেলে সব পাগলামী সেরে যাবে। এখন আমার মায়ের গহনাগুলা বার কর!

লীলা ও হিমাংশুর প্রবেশ

লীলা। কাকা! কাকা! তুমি এসেছ!

(প্রণাম করিয়া পায়ের ধূলা লইল)

মধু। লীলা! আমার লীলা! লক্ষীটী এত বড়টী হয়েছিস্! বাঃ তোর বিয়েও হয়ে গেছে। কই আমাকে ত একটু পত্রও দিস্ নি! সব ভুলে গেছিস্ লক্ষ্মী! সেই রামায়ণ পড়া, সেই রামায়ণকে প্রণাম, মায়ের সঙ্গে ঝগড়া। হাঁরে লীলা মনে পড়ে? আঃ আবার যদি সেইদিন পেতাম রে! আবার যদি— (দীর্ঘনিঃশ্বাস)

(হিমাংশু প্রণাম করিল)

মধু। তুমি? লীলা?

(লীলা লজ্জায় ঘোমটা টানিয়া দিল)

মধু। লীলার স্বামী! বেশ! বেশ! দীর্ঘজীবী হও, সুখী হও, লীলাকে আনন্দে রাখ!

লীলা। কাকা। আমি সবই শুনেছি! ঠাকু'মার গহনা এই আমার গায়ে। আমার বিয়ের সময় বাবা দিয়েছেন! গহনা আমি দিচ্ছি কাকা! আমার বাবাকে রক্ষা কর; আমার এই মিনতি!

(গহনা খুলিতে লাগিল)

মধু। তোমাকে দিয়েছেন! আমার মায়ের গহনা! কিন্তু, তুমি ত আমার পর নও লীলা! এখন আমি কি কর্ব্ব। একটু আগেও বলনি! আমার দলিলটা। আচ্ছা, তাও যাক! যাও লীলা শীঘ্র যাও! ঘর থেকে সরে যাও। গহনা তুমি খুলো না! তোমার শরীর হতে গহনা আমি নিতে পার্ব্ব না। তুমিও যে আমার মা জননী লীলা!

(বাহিরে পুলিশের কোলাহল)

ওঃ, পুলিশ এসে পড়ল! তোমরা এখনি পালাও, পালাও, এই খিড়কীর দোর দিয়ে পালাও। আমি অনাহারে মরব, তবু আমার লীলাকে দুঃখ দিতে পার্ব্ব না! যাও দাদা! এখনি পালাও! নহিলে পুলিশ য়্যারেষ্ট কর্ব্বে। মেয়ের পুণ্যে বেঁচে গেলে এযাত্রা!

সকলের প্রস্থান

না, না, আমার লীলাকে আমি দুঃখ দিতে পারি না, তা আমার যথাসর্ব্বস্ব, আমার জীবন গেলেও নয়!

চতুর্থ দৃশ্য

মধুসূদনের লাইব্রেরী কক্ষ

মধুসূদন রচনায় নিবিষ্টচিত্ত

মধু। ভেবোনা জনম তার এভবে কুক্ষণে,
কমলিনী রূপে যার ভাগ্য সরোবরে,
না শোভেন মা কমলা রূপ অনুক্ষণ;
কিন্তু যে, কল্পনা রূপ খনির ভিতরে
কুড়ায়ে রতন ব্রজ, সাজায় ভূষণে
স্ব ভাষা, অঙ্গের আভা বাড়ায়ে আদরে।
কি লাভ সঞ্চয়ি, কহ রজত কাঞ্চনে,
ধনপ্রিয়? বাঁধা রমা কোথা কার ঘরে?

পাওনাদার—নীতিনাথ, হরেন ও রঘুরাম পাঁড়ে প্রবেশ করিল

নীতিনাথ। আজ সাতদিন হাঁটছি, একটু দেখা পর্য্যন্ত নেই!

মধু। আপনি কে?

হরেন। এখন চিনবেন কেন? টাকা ধার নেবার সময় ত বেশ চিনেছিলেন!

রঘু। আটা, ময়দা, মসলার দাম বাকী আজ তিনটি মাস, একটা আধলা অবধি পাইনি।

মধু। ওঃ আপনাদের বিল আছে! তা রেখে যেতে পারেন। শীঘ্রই পাবেন!

নীতি। আমিও ছাড়ছিনে! কণ্ট্রাকটরী কর্ব্ব। না আপনার পিছু ঘুরব!

মধু। তার মানে? জোর করে নেবেন নাকি? জানেন আমি কে?

রঘু। ওসব কিছু আমি বুঝিনে সাহেব! আমার টাকা আজ চাই!

নীতি। আমারও সেই কথা।

মধু। আপনি না ব্রহ্মতত্ত্ব আলোচনা করেন! তবে, টাকার ওপর এত মায়া কেন? শুনেছি সাহিত্য আলোচনাও করেন!

নীতি। ওসব সখের কথার সঙ্গে টাকার কি সম্বন্ধ মশাই!

মধু। ব্রহ্মতত্ত্ব আর সাহিত্য, সবই সখের বিষয় আপনার?

নীতি। রেখে দিন বাজে কথা। টাকা দিন!

মধু। তার মানে? জোর করে নেবেন নাকি? জানেন আমি কে?

রঘু। ওসব আমি বুঝিনে সাহেব! আমার টাকা আজ চাই-ই!

হেনরিয়েটার প্রবেশ

হেন। আপনারা কেন ঘরের মধ্যে এসেছেন! কেনই বা গোল কর্চ্ছেন অভদ্রের মত! উনি আজ তিনদিন অসুস্থ!

হরেন। অসুস্থ! তার আমরা কর্ব্ব কি? বদ্যি ডাকলেই পারেন! কবিতে লিখিবার সময় ত রোগ থাকে না।

মধু। ঠিক বলেছ! কবিতা লিখবার সময় রোগ থাকে না। তুমি না বাঙ্গালী, আমার দেশের লোক? যদি আমি ইংলণ্ডের কবি হতুম, তবে একথা আমার শুনতে হত না। প্রাচুর্য্যের মধ্যে সুখে থাকতে পার্ত্তুম! তোমার মত মহাজন, কনট্রাকটর, আর মুদি কবির মর্য্যাদা বুঝবে কেন? তোমরা বোঝ কেবল টাকা। এই টাকা যে জগতে প্রথম আবিষ্কার করেছিল—সেই মানুষের পরম শত্রু!

নীতি। তা বই কি? কবিতে গিললেই পেট ভরবে!

মধু। পেট ত পশুতেও ভরায়। তবে, মানুষে আর পশুতে প্রভেদ কোথায় মুদি মশাই? কণ্ট্রাকটর ঘোষ সাহেব?

রঘু। দিন, দিন, আমাদের টাকা বুঝে দিন, লেকচার শুনবার সময় আমার নেই!

মধু। তা থাকবে কেন?

নীতি। মেম সাহেব দিন ত আমার টাকাটা?

(হেনরিয়েটা হাতের বালা খুলিয়া দিলেন—রঘু ছো মারিয়া বালা ধরিল)

নীতি। আমার জিনিষ নিচ্ছেন কেন মশাই!

রঘু। যান, যান, আর যা পারেন নিন গিয়ে!

নীতি। তা হচ্ছেনা মশাই! আমার জিনিষ আপনি পাবেন না মশাই!

রঘুর হাত চাপিয়া ধরিল, এমন সময় লীলা ও হিমাংশু ঘরে প্রবেশ করিল

লীলা। একি? এরা ঘরের মধ্যে কেন?

হেন। আমার ওঁকে আর বাঁচতে দিল না লীলা! সবাই মিলে, তিলে তিলে এঁর আয়ু কেড়ে নিচ্ছে মা!

লীলা। আপনারা কি চান? বেরোন ঘর থেকে; বেরোন বলছি!

নীতি। আমাদের টাকা নিয়ে কথা, দিলেই যেতে পারি।

হিম। এই নাও টাকা! তোমার কত, তোমার কত?

রঘু। আমার দু'শ মশাই।

নীতি। আমার দেড়শ'।

হরেন। আমার আড়াই শ' মশাই।

হিম। এই নাও সবার টাকা। যাও, যাও ঘর থেকে! (টাকা প্রদান)

সকলে। আজ্ঞে! নমস্কার! আমরা তবে আসি!

লীলা। কাকা! কাকা! এ তোমার কি চেহারা হয়েছে? আমায় একটু সংবাদও দাওনি।

মধু। আয়, আয়! আমার লক্ষ্মী লীলা! আমার আর কোন অসুখই নাইরে!

পঞ্চম দৃশ্য

সাগরদাঁড়ী নদীতীর

সময়—১৮৭৩ খৃঃ জানুয়ারী

পণ্ডিতমশাই, মধুসূদন ও গ্রামবাসী

মধু। সত্যি পণ্ডিতমশাই! আবার আপনার দর্শন পেয়ে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি! সেই শৈশব কালের কত যে মধুর স্মৃতি মনে আসছে তা আর কি বলব!

পণ্ডিত। তোমার মত মেধাবী ছাত্র মধু আর পাইনি! পাঠশালায় তুমি ছিলে দুষ্টুর সেরা, আবার পড়াতেও ছিলে সকল ছেলের সেরা! আমি তোমার শিক্ষক, তাই গৌরব বোধ করছি। তোমার মত বিদ্বান কবি বাংলা দেশে আজও জন্মগ্রহণ করেনি। একই আধারে এতখানি বিদ্যা ও কবিত্বের সমাবেশ বিস্ময়কর। এই সাগর-দাঁড়ীর গ্রাম্য বালক তুমি দেশ কালের ব্যবধান অতিক্রম করে, ধরিত্রীর চারণ হয়ে দাঁড়িয়েছ, রুধিতে পারিল না সমুদ্র পর্ব্বত—দুরন্ত সন্ধিৎসা তোমার রথকে টেনে নিয়ে চলেছে। কোন মোহ, কোনও পরিধির ভিতরে তোমাকে রুদ্ধ করে রাখতে পারেনি। তার কারণ, বিদ্যা তোমার কাছে নিঃশ্বাস বায়ুর মত সহজ ও মধুর হয়ে উঠেছে। চৌদ্দটী ভাষাবিৎ—দর্শন, ব্যাকরণ, অলঙ্কার, ইতিহাস, পুরাণ, কাব্য ও বিজ্ঞানে অধীত বিদ্যাবলে বলীয়ান মধুসূদন—তুমি ইচ্ছা করলেই যে কোন কীর্ত্তি রেখে যেতে পার। শুধু মাত্র সাহিত্যিক কীর্ত্তি নয়। তুমি আজ মাতৃভূমি দর্শন কর্ত্তে এসেছ এতে আমি যে পরম আনন্দ লাভ করেছি।

মধু। বিলাত থেকে ফিরলুম, সবাই বল্লেন—দেশে যেয়ো না। সাগরদাঁড়ীর লোক তোমায় ঘৃণা কর্ব্বে। আমি ভাবলুম, কেন? কেন যাব না আমার পল্লী মায়ের কোলে! আমার মা আজ নেই। তাঁর স্মৃতি-ঘেরা এই গ্রামটি তো রয়েছে। তার বুকেই আমি যে তাঁর পদশব্দ শুনতে পাচ্ছি। এর পাখীর গানে যেন আমি মায়েরই আহ্বান বাণী শুনতে পাচ্ছি। মায়ের আহ্বান, আমার মাতৃভাষার আহ্বান যেন আমি প্রতিনিয়তই শুনতে পাচ্ছি। ইংরেজী ভাষায় Captive Ladie লিখেছি, তাতে তৃপ্তি পাইনি, মায়ের আমার মধুর ভাষা! তার শব্দ সম্পদও অপরূপ। নূতন অমিত্র ছন্দ আবিষ্কার করেছি, তাই বাংলার সুধী সমাজ বলেছেন—

"আপনার বীণা, কবি, তব পাণিমূলে
দিয়াছেন বীণাপাণি, বাজাও হরষে!
পূর্ণ হে যশস্বী, দেশ তোমার সুযশে,
গোকুল কানন যথা প্রফুল্ল বকুলে।"

সত্যই এই রচনায় আমি আনন্দ পেয়েছি! এযে আমার মায়ের আশীর্ব্বাদ!

"শিয়রে দাঁড়ায়ে পরে কহিলা ভারতী,
মৃদু হাসি, "ওরে বাছা, না দিলে শকতি
আমি, ও দেউলে কার সাধ্য উঠিবারে?
যশের মন্দিরে ওই, ও যা যার গতি
অশক্ত আপনি যম ছুঁইতেরে তারে।"

আমি ভারতীর আশীর্ব্বাদ পেয়েছি। প্রাণ মন আমার সর্ব্বক্ষণ সেই মায়েরই প্রসাদে পরিতৃপ্ত। সেই কাব্যামৃত পরিতৃপ্ত প্রাণে আমি আমার মেঘনাদ বধ কাব্য রচনা করেছি। আমার মা এই

কাব্যকথা বহুবার বলেছেন, তখন হতেই রামায়ণ আমার মন অধিকার করেছে। এর মধ্য হতেই একটি মণি আমি আহরণ করে ধনবান হয়েছি। যখন আমি এই মেঘনাদবধ রচনা করেছি, তখন আমি তন্ময় হয়ে যেতাম। একদিন সত্যই মনে হল যেন মা আমার কাব্য শুনছেন। আমি একটা অংশ পড়ে শুনালুম। পড়া হতেই মুখ তুলে দেখি কোথায় আমার মা! মা যে তার অনেক আগেও চলে গেছেন, আমার দু'টি নয়ন ভরে অশ্রুর বন্যা নেমে এল, প্রাণ ডুকরে কেঁদে উঠলো।

পণ্ডিত। দুঃখ কি মধু! সকলেরি যে যেতে হবে, একটু আগে আর পরে!

মধু। যাব তাতে দুঃখ নাই! আমি মহিমাময় কায়স্থ দত্ত বংশে জন্মগ্রহণ করে যে কুহকের মোহে আমার মাতা পিতার মনে নিদারুণ আঘাত হেনেছি, সে আঘাত যেন নিয়তই আমার বিবেকে যাতনা দিচ্ছে।

(ধীরে ধীরে বেড়াইতে লাগিলেন)

হাঁ, পণ্ডিতমশাই! ওপারে ঐ কি ফুল ফুটেছে? আকাশ যে আলো করে তুলেছে, আর তার প্রতিচ্ছবি কপোতাক্ষীর সলিলে তরঙ্গে তরঙ্গে ইন্দ্রধনু রচনা কর্চ্ছে!

পণ্ডিত। ওটা পলাশফুল মধু! বাণীর পূজায় প্রয়োজন হয়।

মধু। তাই অত সুন্দর! এই নদী আমার প্রাণ মুগ্ধ করে রেখেছে, সুদূর ইংলণ্ডে বসেও আমি এর কথা ভুলি নি!

"সতত, হে নদ, তুমি পড় মোর মনে
সতত তোমারি কথা ভাবি এ বিরলে,
সতত (যেমতি লোক নিশার স্বপনে

শোনে মায়ামন্ত্রধ্বনি) তব কল কলে।
জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে,
বহু দেশে দেখিয়াছি, বহু নদ দলে,
কিন্তু, এ স্নেহের তৃষ্ণা মিটে কার জলে ?
দুগ্ধ স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।”

কি সুন্দর! কি অপূর্ব্ব শোভা! নৌকাগুলিও চলেছে দাঁড় বেয়ে—সুন্দর! চলুন পণ্ডিতমশাই! আমার জন্মস্থানটী একবার শেষ দেখা দেখে যাই!

দৃশ্যান্তর—মাইকেলের জন্মকুটীর

গ্রাম্য বালক বালিকা ও বধূরা শঙ্খধ্বনি করিল, লাজ ও পুষ্প বর্ষণ করিল,—তাহার মধ্য দিয়া কবি ধীরে ধীরে কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

মধু। আমার শত দুঃখের মধ্যেও আমি আজ আনন্দে উৎফুল্ল হয়েছি! পণ্ডিতমশাই! আমার জন্মকুটীরে আজ আমি এসেছি। আমার পল্লী মায়ের বুকে আমি জীবনের শেষে ফিরে এসেছি! তাই আনন্দ! আবার বিষাদে ভরে উঠছে আমার এই বুকখানি! আমার জন্মভূমিতে, আমার জন্মকুটীরেও আমার স্থান নাই! এমনি অভিশপ্ত জীবন আমার! এইত মায়েরা সবাই এসেছেন! আমায় দেখতে এসেছেন! কিন্তু, ঘরে নিয়ে দু’টি অন্ন দিতেও এদের বাধছে, তাও আমি শুনেছি! যাক, আপনায় আমি একটা কবিতা আজ দিয়ে যাই! আমার দেহ অবসানে কাজে লাগবে! আপনি যে আমায় ভালবাসেন। শুনুন—

দাঁড়াও পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন।
যশোরে সাগরদাঁড়ী, কবতাক্ষী তীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!

ষষ্ঠ দৃশ্য

মধুসূদনের বৈঠকখানা ঘর

মধুসূদন ও মনোমোহন

মধু। তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যের একটু শোন!
ধবল নামেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে,
অভ্রভেদী, দেব আত্মা, ভীষণ দর্শন;
সতত ধবলাকৃতি, অচল, অটল;
যেন ঊর্দ্ধবাহু সদা, শুভ্রবেশধারী,

মনো। বেশ হয়েছে।

মধু। কিন্তু, কবি আজ অর্থ-দৈন্যের শেষ সীমায় উপস্থিত মনোমোহন! এতটুকু ছেলেটি অবধি আজ উপবাসে আছে। আমি লিখতে বসলে আহার নিদ্রা ভুলে যাই। কিন্তু, অনাহারক্লিষ্ট শিশুর আর্তনাদ আমার প্রাণ মন বিক্ষিপ্ত করে দিচ্ছে।

মনো। মাঝে, মাঝে, তাই কান্নার সুর শুনতে পাচ্ছি?

মধু। সে সুর তীক্ষ্ণ বাণের মত আমার বুকে আঘাত করছে।

খালি বিস্কুটের টীন লইয়া আলবার্ট প্রবেশ করিল

আল। আমায় খুলে দাওনা ড্যাডী! বড্ড খিদে পেয়েছে! আমি আর দাঁড়াতে পারছি না। সারাদিন খেতে পাইনি।

মধু। টীনটী হাতে লইয়া বুঝিলেন, ইহা খালি, তাই, নির্ব্বাক নয়নে চাহিয়া রহিলেন সরল শিশুর পানে, তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অশ্রুর বন্যা ছুটিল।

মনো। কি, খুলতে পার্চ্ছ না?

মধু। কি খুলব মনোমোহন! শিশুর স্বপ্ন ভেঙ্গে দেবো!

মনো। তাই ত! তোমার বয়কে ডাকো, আমি টাকা দিচ্ছি! এখনি খাবার নিয়ে আসুক। এত বেলা, আমায় তোমার বলা উচিত ছিল। আমি তোমার পর নই।

মধু। বয়! বয়!

আল। আমার খিদে পেয়েছে ড্যাডী! আমায় খেতে দাও! আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

বয়ের প্রবেশ

মনো। *এই পাঁচ টাকার খাবার এখুনি নিয়ে আয়, যেন এখানেই ছিলি!*

বয়ের প্রস্থান

আল। আমি সইতে পারছি না ড্যাডী! ছুটিয়া যাইতে দরজার চৌকাঠে বাধিয়া পড়িয়া গেল।

মধু। হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা! শীঘ্র এস! উঃ! মুখটা যে কেটে গেছে (আলবার্টকে তুলিয়া) উঃ রক্ত ঝরছে!

ত্রস্ত হরিণীর মত ক্ষিপ্রগতিতে হেনরিয়েটা প্রবেশ করিলেন

হেন। একি ? বাছা আমার অজ্ঞান হয়ে গেছে ! যাবে না, সারাটাদিন খাবার জন্য কেঁদেছে, মা হয়ে ওর মুখে একবিন্দু দুধও দিতে পারিনি ! আমার মরণও হয় না ! মাই চাইল্ড আলবার্ট ! এই দেখ আমি খাবার এনেছি ! একি ! এখনো আমি মিছে কথা কয়ে অজ্ঞান ছেলেকে ভুলাতে চাই ! আমি উন্মাদ হয়ে গেলাম ! মা গো ! আমায় আশ্রয় দাও ! আমি আর সইতে পারি না ! এ যাতনা আর সহ্য হয় না ! (মেঝেয় মাথা খুঁড়িতে লাগিলেন)

মধু। (হেনরিয়েটাকে ধরিয়া) এ কি কর্চ্ছ ? তুমি এ কি কর্চ্ছ ?

হেন। আর কি কর্ব্ব ! মরণেও কি আমার অধিকার নাই ! আমি তাই চাই ! তুমি কবিতা লেখ, আর আমার কচি ছেলে অনাহারে মরুক, এই ত আমার ভাগ্যলিপি !

মধু। ঠিক বলেছ ! হেনরিয়েটা ! কবিতা আমাকে আনন্দ দিতে পারে, প্রতিষ্ঠা দিতে পারে, কিন্তু, তোমার দিকটা আমি একবারও ভাবি না ! তোমাকে এনেছি শুধু দুঃখের বোঝা বইতে !

হেন। দুঃখ আমার নয় ! তোমার সুখেই আমি সুখী। তবে, এই যে শিশুর অনাহার, এই যে যাতনা, এর জন্য প্রাণ যে আমার পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ; মাই ডার্লিং !

মধু। আমি একে এখনি ডাক্তারখানায় নিয়ে যাই !

হেন। না, তা আমি দেবো না ! আমার বাছা যদি মরেও তবু আমার বুক ছাড়া আমি কর্ব্ব না !

আলবার্টকে কোলে লইয়া ঝড়ের মত প্রস্থান

মধু। এই ত কবির জীবন মন্ত্র !

খাবার লইয়া বয়ের প্রবেশ

মনো। এখনি নিয়ে যাও ভিতরে।

বয়ের প্রস্থান

মধু। বাস! ভাবনা কেটে গেল!

জনৈক পূর্ব্ববঙ্গবাসীর প্রবেশ

পূর্ব্ব। মশাই! দুখান বই কিনব বলিয়া আইছিলাম। এতো দেখি বৈঠকখানা, ও কর্ত্তা! বই কি পাওয়া যাইবে? শুনলাম কবি এই বাড়ীতেই থাকে।

মনো। কি বই চাইছেন আপনি?

পূর্ব্ব। আর কোন্ বই! এই কবি মাইকেলের মেগ্‌নাদ বধ কাইব্য একখান, আর ব্রজাঙ্গনা কাইব্য একখান। কি লেখাই লেখছেন এই কবি। এমন বই যে এইদিনে হইতে পারে তাহা আমার ধারণার বার মশাই। সইত্য কথা কইলে, কইতে হয় এমন কবি যে বাংলা দেশে জন্মিছে তাতেই আমরা ধইন্য। মেগ্‌নাদ কাইব্যের ভাষা যেন মেগের গুরু গুরু ডাক! আর ব্রজাঙ্গনা কাইব্যের ভাষা যেন মৌমাছির গুন্ গুন্ গান! এমন না হলি কি কবি হয়। বই দু'খানের দাম কত হবে তা হইলে?

মধু। (দুখানা বই দিয়া) এই নিন্ বই! মূল্য আপনার লাগবে না!

পূর্ব্ব। ক্যান্! গোসা কলেন নাকি? আমরা গ্রামের মানুষ, অত গুছায়ে গাছায়ে কইতে পারিনে, কিন্তু, সইত্য কথা কইতে কি, আমি এই কবিরে ঠিকই ভক্তি করি। আমার পেরণাম দিই তাঁকে। এমন কবি আমার দেশে জন্মিছে ইহাই আমার ভাইগ্য!

মনো। ইনিই সেই কবি!

পূর্ব্ব। হ্যাঁ, এই সাহেব! বাংলা ভাষায় এমন বই লেখছেন! পেরণাম মশাই! আপনার সাহেবী কাপড়ের মইধ্যে যে এমন বাংলা মায়ের মনটা পলাইয়া আছে তার খবর তো জান্তাম না। এই নেন্ পাঁচটা টাহা। এইতে হইবে তো?

মধু। টাকা! টাকা কোনদিন চাইনি আমি। চেয়েছি কবির প্রতিষ্ঠা! ভারতীর আশীর্ব্বাদ! তাই পেয়েছি আপনার অন্তরের মধ্যে। এইত আমার পরম পুরস্কার। টাকা আপনি ফিরিয়ে নিন্।

পূর্ব্ব। তবে আসি, নমস্কার। আবার দেখা হইবে।

প্রস্থান

মনো। তোমার উপর লক্ষ্মীর অভিশাপ আছে মধু! নহিলে এত দৈন্যের মধ্যেও তুমি টাকা চিন্‌লে না।

মধু। টাকা! টাকা! টাকা! তাই যদি চাইতুম, মনোমোহন! তবে মুদির দোকান, না হয় কনট্রাক্‌টরী কর্ত্তুম। কাব্য লিখতুম না! কিন্তু ওই যা বল্লে, কমলার অভিশাপ আছে আমার ওপর, তা সত্যি!

ভেবেছিনু মোর ভাগ্যে, হে রমা সুন্দরি!
নিবাইবে সে রোষাগ্নি, লোকে যাহা বলে,
হ্রাসিতে বাণীর রূপ তব মনঃ জ্বলে।
ভেবেছিনু, হায়! দেবি ভ্রান্তিভাব ধরি,
ডুবাইছ, দেখিতেছি ক্রমে সেই তরী;
অদয়ে! অতল দুঃখসাগরের জলে
ডুবিনু, কি যশঃ তব হবে বঙ্গস্থলে?

সপ্তম দৃশ্য

উত্তরপাড়া। জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের লাইব্রেরী ঘর

মধুসূদন ও মনোমোহন

মধু। কলকাতায় আমার অচল হয়ে উঠেছিল। এখানে এসে তবু বাড়ী ভাড়াটা বেঁচেছে! গৌর, আর তোমার, এ ব্যবস্থা ভালই মনে হচ্ছে! আরও ভাল, যে পাওনাদারের তাগিদ্ থেকে বেঁচেছি। পাওনাদার দেখলে আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে ওঠে! কবিতায় রস শুকিয়ে যায় ভাই!

মনো। কিন্তু, তোমার স্বাস্থ্যের জন্যও দরকার মধু। তোমার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়েছে। রাত্রি জেগে আর বই পড়ো না। গ্রীক্, ল্যাটীন, ইটালীয়ান ভাষার বইগুলা বুঝতে মনের উপর জোর পড়ে বই কি? মাতৃভাষার চর্চ্চাও এখন কমিয়ে দাও। আর মদটাও বড় বেশী চালাচ্ছ মধু। ওতে যে তোমার লিভার নষ্ট করে দিচ্ছে।

মধু। আমার কবিত্বই যখন নষ্ট হয়ে গেল, তখন আর স্বাস্থ্য দিয়ে কি কর্ব্ব ভাই। এই মদই এখন আমায় ভুলিয়ে রেখেছে সর্ব্ব গ্লানি! যখন আত্মচিন্তা করি তখন আমি উন্মাদ হয়ে যাই। এই শোন আমার আত্মবিলাপ কবিতা। আমার মনের অবস্থা বুঝতে পার্ব্বে!

আশার ছলনে ভুলি,
কি ফল লভিনু হায়! তাই ভাবি মনে?
জীবন প্রবাহ বহি কাল সিন্ধু পানে ধায়
ফিরাব কেমনে?
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন,
তবু এ আশার নেশা ছুটিল না?
এ কি দায়!

যশোলাভ-লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি হায়!
কব তা কাহারে?
সুগন্ধ কুসুম গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধায়,
কাটিতে তাহারে,—

আমার শরীরটা অবসন্ন বোধ কর্চ্ছি মনু! ধর, আমায় একটু ধর! উঃ আর দাঁড়াতে পারছি না। সর্ব্বশরীর যেন জ্বলে গেল, জ্বলে গেল! (রক্তবমন)

মনো। এ কি রক্ত!

মধু। হাঁ মনু, রক্ত। তোমাদের বলি না, প্রায়ই রক্তবমন হচ্ছে। উঃ আবার জ্বালা কচ্ছে বুকটায়। একটু হাত বুলিয়ে দাও না ভাই! (রক্তবমন) উঃ আর পারি না, আমার চোখে যেন জগৎ রক্তময় দেখছি ভাই! একটু ধর, ঐখানটায় একটু শুইয়ে দাও! হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা! মাই ডার্লিং শীঘ্র এস। আলবার্টকে ডাকো! আমি যে চল্লুম! তোমাদের ভাবনাটাই বড় করে মনে আস্‌ছে!

হেনরিয়েটা ব্যগ্রভাবে প্রবেশ করিলেন

হেন। এ কি? রক্ত! আবার রক্ত উঠছে! ও মাই লাক।

মধুসূদনের মাথায় ও গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন

মধু। এ কি? তোমার হাতটা যে আগুন! হেনরিয়েটা! তোমার জ্বর?

হেন। ও কিছু না, এখুনি ভাল হয়ে যাবে।

মধু। এখনি ভাল হয়ে যাবে! মনু! হেনরিয়েটা বলছে এখুনি ভাল হয়ে যাবে! আজ দশটী দিন ওর প্রবল জ্বর। পথ্যটুকুও পাচ্ছে না,

আলবার্ট কচি ছেলে, তার খাবারও নেই! না, আছে, আছে! এই দেখ ভাই, আলবার্টের খাদ্য!

বাসীভাতের থালা হাতে তুলিয়া

উঃ, কী পচা দুর্গন্ধ! এই তোমার প্রিয় কবির প্রিয় পুত্রের খাদ্য! তাও পায় না ভাই সকল দিন! আর এই হেনরিয়েটা! তিলে তিলে জীবন আহুতি দিচ্ছে! খাবার পায় না, পথ্যও পায় না, ঔষধের তো কথাই নাই!

হেন। এত উত্তেজিত হয়ে কথা কইলে শরীর যে আরও দুর্ব্বল হবে।

মধু। আর বাকী কতটুকু! বলতে পার হেনরিয়েটা, আর খারাপ হতে বাকী কি? আমার তবু আত্মপ্রতিষ্ঠার আশা আছে, কাব্যখ্যাতি রইবে জগতে! কিন্তু তোমার কি রইবে? হেনরিয়েটা! কেন এই হতভাগ্যকে বরণ করেছিলে? কমলার অভিসপ্ত জীবন আমার— সরস্বতীর আশীর্ব্বাদ তাকে কিছুতেই রক্ষা করতে পার্লে না!

মনো। একটু চুপ কর ভাই! আত্মহত্যা করো না।

মধু। কেন কর্ব্ব না! তিলে তিলে আয়ুহীন, অভাবের তাড়নায় উন্মাদ আমি, কৈ আমার দেশবাসী আমায় তো দেখলো না। তাদের জন্যই আমি জীবন নিঃশেষে বিসর্জ্জন দিয়েছি, কিন্তু আমার জন্য তারা কি কর্ত্তব্য করেছে? আমার বইগুলি যদি আদর পেত, তবে আমার এই হীনদশা হত না! বর্দ্ধমানের মহারাজকে জানিয়েছিলুম— আমাকে তাঁর সভাকবি পদে নিয়োগ করুন। তিনি প্রত্যাখ্যান কর্লেন। তাঁর অগাধ ঐশ্বর্য্য! অথচ—যাক ভাই সে কথা। আমি যদি স্বাধীন দেশের কবি হতুম, ইংলণ্ড, ফ্রান্সের কবি হতুম, তবে, আমার ঐশ্বর্য্যে জগতের শ্রেষ্ঠ ধনীও ঈর্ষ্যা করত ভাই। উঃ আর পারি না, বড় জ্বালা! বুকের মধ্যে যাতনার প্রবাহ চলছে,—যেন আগ্নেয়গিরির প্রচণ্ড তাপের বন্যা ছুটে চলেছে।

আবার, মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছে! অসহ্য জ্বালা, জ্বালা ; দেখ, দেখ, ভাই মন্থ! তুমিও একটু হাত দিয়ে দেখ! বিদ্যাসাগর, গৌর, আর তুমিই যে আমায় এতদিন বাঁচিয়ে রেখেছ! তোমাদের ঋণ যে আমি জন্ম জন্মান্তরেও পরিশোধ করতে পার্ব্বনা ভাই। হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা! একি? এও যে অজ্ঞান হয়ে পড়ল ভাই! উঃ আর যে সইতে পারি না—মন্থ!

"Out, out, brief candle!
Life's but a walking shadow,
a poor player,
That struts and frets his hour
upon the stage,
And then is heard no more ;
it is a tale.
Told by an idiot, full of
Sound and fury.
Signifying nothing."

হেন। না প্রিয়তম! এই ত আমি বেঁচেই আছি। আমার যত ভাবনা তোমার জন্য! আমার জন্য আমি এতটুকুও ভাবিনা!

মধু। বেঁচে আছ! মাই বিলাভেড্ হেনরিয়েটা! তুমি আমায় জীবনের শেষেও কি আপনাকে লুকিয়ে রাখবে। দেবে শুধু সেবা আর সান্ত্বনা! আমি দেখতে পাচ্ছি তোমার জীবন দীপ ধীরে ধীরে নিভে আসছে।

হেন। আমি! আমি বাঁচতে চাই না প্রিয়তম! আমায় আশীর্ব্বাদ দাও, যেন তোমার উপর বিশ্বাস রেখে, নির্ভর রেখে, আমি বিদায়

নিতে পারি। আমি আর বেশীদিন নাই, আমার মিলটন! আমার আলবার্ট রইল, তাদের দেখো! বিদায় দাও মাই ডার্লিং!

মধু। সবাই বিদায় নেবে! রইবে এই ভাগ্যহীন, সহিতে যাতনা কেবল!

অষ্টম দৃশ্য

আলিপুর জেনারেল হাসপাতাল কক্ষ

সময়—১৮৭৩ খৃঃ ২৯শে জুন, রবিবার

মধুসূদন ও মনোমোহন

মনো। একটু চুপ কর মধু! এত উত্তেজিত হয়ো না, অসুখটা যে বেড়ে যাবে!

মধু। আমি চুপ কর্ব্ব! আজ আমি চুপ কর্ব্ব! এ তুমি কি বলছ মনু! আমার প্রেমময়ী-পত্নী হেনরিয়েটা আমায় ছেড়ে চলে গেল! শত-দুঃখের মধ্যেও যে সে আমায় সান্ত্বনা দিত ভাই! আমার চীৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছা কর্চ্ছে! হেনরিয়েটা! হেনরিয়েটা! কোথায়, কোথায় তুমি! আমাকে ফেলে মাই ডার্লিং তুমি কোথায় লুকালে! তোমার মিলটন, তোমার আলবার্টকে কাকে দিয়ে গেলে! সবদিকে ফাঁকি দিয়ে আমাকে এই অবস্থায় রেখে তুমি যেতে পার্লে? উঃ আর যে সইতে পারি না মনু! আলবার্টকে একটু আমার পাশে আন, দেখি, তাকে একবার শেষ দেখা দেখে যাই! মাতৃহারা সন্তান আমার! হতভাগ্য সন্তান আমার! দাও ভাই! তাকে ডেকে দাও!

মনো। একটু চুপ কর! সংবাদ পাঠিয়েছি, এখুনি আসবে আলবার্ট!

মধু। এখনি আসবে! কিন্তু, তাকে আমি কি বলে বুঝাব ভাই আমার প্রাণ মন হাহাকার কর্চ্ছে! আমি···

আলবার্টের প্রবেশ

মাই চাইল্ড! এসেছিস! আমার হতভাগ্য সন্তান এসেছিস! মাতৃহারা সন্তান এসেছিস! আয়! আয়! আরো কাছে, আরো কাছে, একেবারে বুকের মধ্যে আয় রে! তোকে আর আমি ছাড়ব না, যে কটা দিন আছি, তোকে আর ছাড়ব না!

আল। ড্যাডী! ড্যাডী! ম্যামী কোথায়?

মধু। ম্যামী কোথায়! এখনো বুঝছিস্ না হতভাগ্য আলবার্ট! তোর মা, আমাকে, তোকে, সবাইকে ফাঁকি দিয়ে গেছে! ঐ শোন! স্বর্গের দুন্দুভি! চুপ করে কান পেতে শোন, তোর মায়ের কণ্ঠস্বর হয়ত তুই শুনতে পাবি! বুঝতে পারবি! কে? কে? আমার হেনরিয়েটা—আমায় ডাকছে! আলবার্ট! তোকে যে আমি আর দেখতে পাচ্ছিনা, আমার এই হাতটা ধর। আরও কাছে আয়! চোখ যে নিবিড় অন্ধকারে ভরে উঠলো! ঐ শোন স্বর্গের দুন্দুভি বাজছে, শঙ্খ বাজছে! ভাই মনু! আলবার্ট রইল, তাকে দেখো! আমার আর কিছুই যে নাই রে ভাই!

"উঠিল গগন পথে রথবর বেগে,
বরষিলা পুষ্পাসার দেব কুল মিলি,
পূরিলা বিপুল বিশ্ব আনন্দ নিনাদে!"

মনোমোহন ভাই! আলবার্ট! আবার শোন! হেনরিয়েটা ডাকছে আমায়! আরও শোন—রিসাইট্ করছে—

"করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্দ্র অশ্রুনীরে
বিসর্জ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে।
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে!"

যবনিকা

মা, মন্ত্রশক্তি প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা, বাংলার ভারতী
শ্রীমতী অনুরূপা দেবীর—

আশীর্ব্বাণী

বাংলাকে চিনিতে হইলে তার অতীতকে চিনিতে হইবে। বিশেষ করিয়া বর্ত্তমান বাঙ্গালীকে জানিতে হইবে। অন্ততঃ তাদের পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দী পূর্ব্বের বাঙ্গালীর ইতিহাস। সেই সময়ের যে সকল বঙ্গ যুবক আজিকার এই নবীন বাংলার, নব্য-ভারতের স্বজন কার্য্যের অগ্রদূতরূপে এই বঙ্গ-জননীর বক্ষে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, মধুসূদন তাঁদের মধ্যের একজন বিশেষ ব্যক্তি। এই ধূমকেতু তাঁর আকস্মিক আবির্ভাবের ও তিরোভাবের মধ্যে বঙ্গবাসীকে অনেক কিছুই দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁর সাহিত্যিক দান যেমন অভূতপূর্ব্ব প্রভাবশালী, তাঁর উচ্ছৃঙ্খল জীবন আদর্শ তেমনই তাদের পক্ষে রক্ষাকবচ। এই চরিত্রের আলোচনা বহুল প্রচার এদিনে সঙ্গতই হইয়াছে; বিশেষতঃ যশোরবাসী সাহিত্যিকের পক্ষে।

শ্রীযুক্ত অবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণ মহাশয়ের লিখিত "মহাকবি মধুসূদন" নাটকখানি আমার ভালই লাগিল। দেশবাসীরও নিকট আদরণীয় হইবে আশা করিতেছি।

একই চরিত্র লইয়া বহু রচনা হইয়া গেল, এই বার আমরা ঐ ঘটনা-বহুল, বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনসম্পন্ন বহু বঙ্গ-রথীর অভ্যুদয় যুগের অন্যান্য ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মহাত্মা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরও নাটকীয় রঙ্গভূমে অভ্যুদিত দেখিতে উৎসুক রহিলাম। তাঁহাকেও এই সম্বন্ধে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছে।

৭ই ফাল্গুন, ১৩৫০
কলিকাতা

শ্রীমতী অনুরূপা দেবী

বাঙ্গালীর জীবনে বৈচিত্র্যের অভাব এ কথাটার একটা বড় ব্যতিক্রম মাইকেল মধুসূদন। বাঙলা দেশে খাঁটি বাঙালী পরিবারে জন্ম হইলেও ইহার জীবন বিচিত্র ঘটনার সমাবেশে অপূর্ব্ব। এই নাটকীয় জীবনটিকে পট-প্রদীপে উদ্ভাসিত করিয়া তুলিতে বঙ্গ নাট্যকারগণ আগ্রহশীল হইবে ইহাতে বিস্ময়ের কিছু নাই।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে মধুসূদনকে কেন্দ্র করিয়া কতকগুলি নাট্য-রচনা আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কবিরাজ অবলাকান্ত কবিভূষণ লিখিত নাটক "মধুসূদন" তাহাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিবে, ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

প্রধান চরিত্রের ঐতিহাসিক মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ না করিয়া, ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া নাটকীয় পরিবেশের মধ্যে স্বচ্ছন্দ ও সতেজ ভাষায় নাট্যকার চরিত্রের যে রূপ দান করিয়াছেন তাহা সাহিত্য-রসিককে তৃপ্তি দিবে।

এই রচনাটি সর্ব্বত্রই সমাদৃত হইবে ইহাই ভরসা করি।

যশোহর
৬ই ভাদ্র, ১৩৫১

শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দত্ত
এম্-এ, বি-সি-এস

বাণী

সাহিত্য ভারতী শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

"মহাকবি মধুসূদন" নাটকখানিতে অবলাকান্ত বাবুর নাটকীয় চিত্র রচনার দক্ষতা ও দরদী প্রাণের পরিচয় পাইয়াছি। নাটকখানি রসোত্তীর্ণ হইয়াছে। শেষ দৃশ্য পড়িতে গিয়া চক্ষু শুষ্ক রাখা সম্ভব হয় নাই। অবলাকান্ত বাবু মহাকবির একজন একনিষ্ঠ ভক্ত, তাঁহার নাটকের দৃশ্যগুলি সম্পূর্ণ সজীব রূপে প্রতিভাত হয়।

নটশেখর শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র

নাট্যকার শ্রীঅবলাকান্ত মজুমদার কবিভূষণের প্রতিভার বিচিত্র শতদল তাঁহার রচনা "মহাকবি মধুসূদন" জীবন-নাট্যের মধ্য দিয়া বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে এবং চতুর্দ্দিকে সৌরভ ছড়াইতেছে। এই রসোত্তীর্ণ নাটকখানি আমার ভাল লাগিয়াছে, অভিনয়ে সাফল্য লাভ করিবে।

—— • ——